بسم الله الرحمن الرحيم

সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?

একটি মিডিয়া তৈরি তথ্য সন্ত্রাস

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৩২ নং আয়াতের তেলাওয়াতের মাধ্যমে লেকচার সুচনা করেন কারী রোহান গালিব। প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন মোহাম্মদ নায়েক :

এরশাদ হচ্ছে : "যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।"

ডা. জাকির নায়েকের স্বাগত বক্তব্য : আমি সেইসব মুসলিম অমুসলিম পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে "সন্ত্রাস ও মুসলমান" এ বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশকে। তিনি ছিলেন বোম্বের হাইকোর্টের একজন বিচারক এবং ১৯৯১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মানবাধিকার আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক, বিচারক হসবেট সুরেশ ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সাধারণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন আইন বিষয়ক পত্রিকা, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তার নতুন বই "ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস এ্যাজ হিউম্যান রাইটস" এক বাক্যে অসাধারণ। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৯২-৯৩ সালে বোম্বের ওপর লেখা তার প্রতিবেদনের জন্য তিনি সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। যার শিরোনাম ছিল "জনগণের বিচারক"। গুজরাটে মুসলমান গণহত্যার ওপর লেখা তার প্রতিবেদন "ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি" (মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ) ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে আহমেদাবাদে প্রকাশিত হবার পর তিনি যথেষ্ট পরিমাণ প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার প্রতিবেদনে উঠে আসে- মুম্বাই-এর দলিত, কেরালার ছাত্র, গুজরাটের খ্রিস্টান এবং এরূপ আরো কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয়, যেগুলো সত্যিই দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত। আমি প্রধান অতিথিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

বিচারক হসবেট সুরেশ এর বক্তব্য :

বন্ধুরা, আমি শুরুতেই ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিচারক লর্ড টার্নিগের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন- "বিচারকরা অভিনেতাদের মতো অন্যকে খুশি করার জন্য, উকিলদের মতো মামলায় জেতার জন্য, ঐতিহাসিকদের মতো অতীতকে জানার জন্য কথা বলে না; বরং বিচারকরা কথা বলে রায় দেয়ার জন্য।" আমিও একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বটে; কিন্তু টায়ার্ড নই। অবশ্য আমি এখানে কোন রায় দেব না শুধু কথা বলব। আমি মানুষের বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাই মানুষের অধিকার নিয়ে আগেও কথা বলেছি। যখনই কোন অন্যায়, বিশৃঙ্খলা চোখে পড়েছে তখনই তার প্রতিবাদ করেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি সব সময় চেয়েছি বিচারকরা এসব বিষয়ে কথা বলুক। কারণ তারা যদি এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ না করে

তাহলে কেইবা এর প্রতিবাদ করবে? আমাদের কাছে এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে, সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের সরকারই আরো বেশি সহিংসতার জন্ম দেয়। আর এভাবেই এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। এভাবে এ পদ্ধতিতে সন্ত্রাস দমন তথা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

টাডা আইনের প্রহসন

১৯৮৪ সালে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেটা করেছিল খালিস্থানীরা। সে সময় সন্ত্রাসী গ্রুপ খালিস্থানীদের বিরুদ্ধে ভারতে বিদ্রোহ চলছিল, তখন আমরা "টাডা" নামক একটা আইন প্রণয়ন করি যেটা ছিল খুবই কঠোর। আপনারা জানেন যে, টাডার অনেক অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হয়েছে। এই আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে আটক করা হয়েছে। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমার মনে পড়ে পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন প্রবীণ বিচারক অজিত সিং বেইন্‌স্ একটা জনসমাবেশে তৎকালীন সময়ে ভারতে চলমান অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একদিন আমরা এই আইন থেকে মুক্তি পাব। উক্ত 'টাডা' আইনে দেশের সংহতি নিয়ে একটা বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে– দেশের সংহতি নষ্ট হয় এমন কোন কথা, কোন মন্তব্য কেউ করতে পারবে না এটা আইনত অপরাধ। তাই বিচারক অজিত সিং আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন– আমরা এই আইন তথা এই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব।

তাকে আটক করা হল এবং তাকে পরানো হলো হাতকড়া। আইনটা এমনই ছিল যে, একজন বিচারকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো হাইকোর্টে। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারকরা জামিন দিতে পারল না। অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গেলেন। সেখানেও জামিন বা মুক্তি না পেয়ে তিনি জেলখানার মধ্যে কাটালেন এক বছরেরও বেশি সময়। আর সবশেষে দেখা গেল এটা কোন কেইস বা মামলা নয়। 'টাডা' আইনের ক্ষমতাবলে পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছিল। সবাই ছিল জেলখানায় কাউকে জামিন দেয়া হয়নি। এই আইনের আওতায় পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভয়ংকর সব নির্যাতন চালাত। তারপর ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার 'টাডা' নামক এই জঘন্য আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করল। তখন দেখা গেল হাজার হাজার মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার করা হয়েছে। বাহাত্তর হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হল যাদের মামলা, বিচার কিছুই হল না। শুধু তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলখানার ভেতরে অত্যাচার সহ্য করেছে।

তাছাড়া এই জঘন্য 'টাডা' আইনে আমরা দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছি মাত্র (১.৮%) এক দশমিক আট শতাংশ লোককে। কিন্তু তারপরেও এক সময় এটা বলবৎ ছিল যার ফলে পুলিশ হয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচারী। যা খুশি তাই করতে পারত কেউ কিছু বলতে পারত না। রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই আইনকে ব্যবহার করত। যেকোন লোককে আটক করে জেলখানায় বন্দী করে রাখতে পারত এবং কোনভাবেই জামিন পাওয়া যেত না। অতঃপর ১৯৯৬ সালে 'টাডা' আইন বাতিল করা হল কারণ এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আমরা সবাই এর প্রতিবাদ করছি এটা একটা নিষ্ঠুর আইন। এ ধরনের কোন আইন আমরা চাই না। এ ধরনের আইন দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না; আরো বাড়বে।

পোটা আইনের প্রহসন

এরপর ঘটল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই দুর্ঘটনা। নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক প্রলয়ংকরী ঘটনা। মি. বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং বললো, যারা আমাদের সাথে নেই তারা আমাদের শত্রু। তখন আমরা আমেরিকা তথা বুশের পক্ষ অবলম্বন করলাম এবং "পোটা" আইন প্রণয়ন করলাম। এই আইনেও সে একই ঘটনা ঘটল। পোটা বহুমুখী একটা আইন। এর আওতায় আপনি যে কাউকে আটক করতে পারেন। টাডা আইনের ন্যায় এখানেও অনেক মানুষের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। চাই সে সন্ত্রাসী হোক বা না হোক। এমনকি তারা অনেকেই জানেনা তাদের অপরাধ কি? এ ধরনের আইন মানুষের মধ্যে শুধু আতংকেই বাড়ায়। এই কথাটা প্রাসঙ্গিক, কারণ মানুষ এখন 'পোটা' নিয়ে কথা বলে এবং 'পোটা'র মত আইন চায় না।

২০০৬ সালে বোম্বে ট্রেনের বোমা বিস্ফোরণ এবং তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করেছে যে, কঠিন কোন আইন ছাড়া সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। কিন্তু আমি বলি, কঠিন কোন আইন দিয়ে সন্ত্রাস থামানো যায় না। এদেশ কেন? পৃথিবীর কোথাও এর নজীর নেই। আমাদের দেশের এ 'পোটা' আইন নিয়ে (পার্লামেন্ট) সংসদেও বিতর্ক হচ্ছে। বিতর্কের এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে আক্রমণ করা হল। অবশেষে যখন এ আইনটা পাশ করা হলো, তখন কলকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রে বোমা মারা হল। এভাবে ২০০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আকশারাধান মন্দিরে, ২০০২ সালের ২৪ নভেম্বর রঘুনাথ মন্দিরে, ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ঘাট কুপায় বুলুন্দে, ২০০৩ সালের ২৫ আগস্ট "গেট অফ ইন্ডিয়ায়" বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই আইন থাকা সত্ত্বেও একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। 'পোটা' আইন দিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না।

২০০২ সালে তৎকালীন ভারতের এ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, সে বছর জম্মু ও কাশ্মীরে সব মিলিয়ে (৪০৩৮) চার হাজার আটত্রিশটি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে অনেক আর্মি, নিরাপত্তা রক্ষী এবং এই আইনটা বলবৎ ছিল। সে সময়েই সেখানে ১০০৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে ৫০৮ জন অন্য দেশের নাগরিক। কাশ্মীরে গত সতের বছরে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছে ৮০ সহস্রাধিক মানুষ, হারিয়েও গেছে অনেকে। এক ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে। সে সময় পাঞ্জাবে খালিস্থানীদের বিদ্রোহ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে কেউ জানেনা তাদের কি হয়েছে। এমন কি কয়েক বছর আগেও 'বিয়াস' নদীর তীরে অনেক লাশ, কংকাল ও মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে।

আমি একবার একটা তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে ঘুরে লোকজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম সেখানের বেশির ভাগ বাড়িতে বয়স্ক লোকজন, শিশু বাচ্চারা আছে; কিন্তু কোন তরুণ বা যুবক নেই। তাদের কি হয়েছে তাও কেউ বলতে পারেনা। তারা শুধু এতটুকু জানে যে, গভীর রাতে তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তারা আর ফিরে আসেনি। এ ঘটনার আট দশ দিন পর বিভিন্ন জায়গায় তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এমনই ছিল সেই আইন, যেখানে সহিংসতা ছিল একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং খুনের পরিবর্তে খুন সেখানে অহরহ ঘটত। মনিপুর, ছত্রিশগড়, তেলেঙ্গানা এরকম আরো অনেক জায়গায় খুনোখুনি, হত্যাযজ্ঞ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বললেন– আমাদের একটা সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ প্রয়োজন।

অনেকদিন আগে কাশ্মীরে আমরা একটা পরীক্ষা করেছিলাম। তাদেরকে জেলখানার ভিতর আটকে রেখেছিলাম বছরের পর বছর। এরপর পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল। সরকার তাদের মগজ ধোলাই করে বললো– তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের লোকদেরকে বোঝাও এভাবে যুদ্ধ করতে নিষেধ কর এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বদলানোর ব্যাপারে সহায়তা কর। তখন তারা বললো আমরা ফিরে গেলেই আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। তারপর আমাদের সরকার বললো আমরা অস্ত্র দেব অবশেষে তারা অস্ত্র হাতে ফিরে গেল।

আমার মনে আছে, একবার নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবে "ডেমোক্রেটিক রাইটস্ অর্গানাইজেশন" (গণতান্ত্রিক অধিকার সংস্থা) একটা প্রতিবেদন ছাপাল। সেখানে বলা হলো যে, পাঞ্জাবে ভোট নেয়া হচ্ছে বন্দুকের মুখে, সেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ আরো অনেক মানুষ দল, গোষ্ঠির কাছে ব্যাপক অস্ত্র রয়েছে। এক কথায় ভারতের মানুষ এখন বন্দুকের মুখে, সহিংসতার জবাব সহিংসতা দিয়েই দিচ্ছে। এভাবে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

ছত্রিশগড়ে অনেক মাওবাদীরা ও নকশালপন্থীরা আছে। তাদেরকে শেষ করার জন্য প্রায় ৫০০০ আদিবাসী নিয়ে "সালওয় জুলুম" নামে একটা বাহিনী তৈরি করা হল। এর ফলাফলটা দাড়াল আদিবাসীরা সব মারা গেল এবং নকশালপন্থীরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের একটু ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত এদেশে কোন সন্ত্রাসীর প্রকাশ্যে বিচার হয়নি শুধু হত্যা করা হয়েছে। যেমন– বোম্বেতে ১৯৯৩ সালে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। এর আসল অপরাধী কারা আমরা এখনো তা বের করতে পারিনি। এর পাশাপাশি অনেক লোকজন জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে বছরের পর বছর। কবেইবা তাদের মামলার শুনানী হবে, বিচার হবে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই বলতে পারে না, এটাই বাস্তবতা। এছাড়া 'আকশারধাম' মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছিল। এখানে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের মেরে ফেলা হল। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হলেও কাজটা আসলে কারা করেছিল তা আমরা জানি না। এ ধরনের কাজই আমরা করে যাচ্ছি। সহিংসতার জবাব দিতে গিয়ে আমরা আরো বেশি সহিংসতার সৃষ্টি করেছি। এভাবেই চলছে দেশের জীবন ব্যবস্থা। এমনকি নাইন-ইলেভেনের (১১সেপ্টম্বর) পর বুশ সন্ত্রাসের অজুহাতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

আফগান হামলা

এ যুদ্ধ ছিল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে। বুশ আফগানিস্থানে বোমা হামলা করলো, অসংখ্য গরীব, অসহায়, নিরাহ নারী পুরুষকে হত্যা করলো প্রকৃয়ায় কেউ বলতে পারে না ওসামা বিন লাদেন আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। ইরাককেও একই বুশ প্রশাসন কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ করে বসলো। ইরাকে তালেবান এবং ভয়ংকর সব রাসায়নিক অস্ত্র আছে। আর শুধুমাত্র অলিক সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই বুশ ইরাককে প্রতিপক্ষ করে বোমা হামলা ও যুদ্ধ শুরু করলো। অনেক নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেল। এ পর্যন্ত নিউইয়র্ক সন্ত্রাসী আক্রমণে যত লোক মারা গেছে, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে যত লোক মারা গেছে তার বিশগুণ বেশি মানুষ মারা গেছে শুধুমাত্র ইরাকে। এভাবেই মানুষ মারা যাচ্ছে। এখন আমরা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করব কাকে? আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি........ বর্তমান বিশ্বে যদি কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে সেটা হবে জর্জ ডব্লিউ বুশ। তিনি একটা অযৌক্তিক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন, সকল আইন লংঘন করলো, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনেরও তোয়াক্কা করা হয়নি।

হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, নির্বিশেষে আমাদের যে কেউ এ যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে পারে সে অধিকার আমাদের আছে। কারণ শুধু নিন্দা ও প্রতিবাদ করলেই আমরাও সন্ত্রাসী হয়ে যাব না। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো– সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করা তথা বিশ্বের মাঝে সন্ত্রাসের পরিচিতি তুলে ধরা। আর কিভাবে আপনি সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দিবেন? 'টাডা' 'পোটা' এ সমস্ত তথাকথিত আইনেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। শুধু সন্ত্রাসী কাজের সংজ্ঞা দেয়া আছে। আর এরকম কাজের কথা যথা- নরহত্যা, খুন, ডাকাতি, অস্ত্রবাজি, এসব ভারতের পেনাল কোর্টে আছে। কিছু সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে; কিন্তু তারপরও পুলিশ তার নিজের সুবিধা মত এসব কাজকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অবিহিত করছে। যদি আপনারা সবাই মেনে নেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করাই সন্ত্রাসী কাজ যেটা বেশিরভাগ সংজ্ঞার মূল কথা তাহলে আমি বলব গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমার আঘাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। ৬০ বছর পরেও এখনো অনেক মানুষ সেই বোমার ক্ষত নিয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে। একইভাবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী দেশ দুইটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট বৃটেন। বুশ ও লস্করে-এ-তৈয়বা দু'জনেই হত্যায় বিশ্বাসী। খুনোখুনির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র তাদের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বাজার তৈরির চেষ্টা করছে। এদের দুজনই ক্ষমতার লোভী তবে একজন অন্যজন অপেক্ষা শক্তিশালী। এভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপই হয়ে পড়েছে আমেরিকান পলিসির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, এর কোন শেষ নেই। মানুষ যদি এই সন্ত্রাসে আতংকিত হয়ে থাকে, তাহলে তারা খুশি, এখানেই তাদের সাফল্য ও স্বার্থকতা।

আর এতে করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেটা হচ্ছে সেটা হলো মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার আস্তে আস্তে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। আমরা এখন ধীরে ধীরে একটা সিকিউর সোসাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছি। এখানে আপনারা প্রবেশের সময় প্রত্যেককেই চেক করা হয়েছে। এটা হচ্ছে নিরাপত্তা তথা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা।

আর এইভাবে আমরা নির্মাণ করছি একটা নিরাপদ সমাজ, নিরাপত্তাই যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য, স্বাধীনতা বা অধিকার নয়। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম– 'অ্যাডভান্সড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম' চালু হয়েছে। অর্থাৎ মনে করেন আপনি লন্ডনে আছেন, ১৫ মিনিটের মাধ্যমে আপনার সব ইনফরমেশন বোম্বেতে বা অন্য যে কোন জায়গায় পাঠানো যাবে। আপনি যেখানে যাবেন পুলিশ সেখানেই আপনার পেছনে থাকবে এবং তারা যা খুশি তাই করতে পারবে। একবার আর্মস্টার্ডামে তারা কয়েকজন লোককে দেখল। লোকগুলো ছিল একটা প্লেনের মধ্যে এবং তাদের চালচলন, ব্যবহার, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, চেহারা সবই ছিল সন্দেহজনক। তাদের দেখে মনে হচ্ছে আরব, মুখে লম্বা দাড়ি আর মহিলারা বোরকা পরা। তারা বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এ সবই যখন সন্দেহজনক তখন তাদের কাছে মনে হল নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এর কারণে সর্বত্র গোয়েন্দাগিরি বাড়ছে যার ফলে পুরা দেশজুড়ে অন্যায় অবিচার বেড়ে চলেছে। পত্রিকায় আসছে যে 'অ্যানটপ হিলে' একটা লাশ পাওয়া গেছে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে যেখানে কেউই ছিল না। কিভাবে জানি পুলিশ জানতে পেরেছিল লোকটা পাকিস্তানি এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তদুপরি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমাজ মেনে নিল, কেউই প্রতিবাদ করেনি। কেন মারা গেল কেউ জানে না। আর পুলিশও এ ধরনের আইন চায় যেখানে প্রমাণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং তারা যে কাউকে কোন

প্রকার অভিযোগ ছাড়া তদন্তের নামে থানায় আটক রাখতে পারে। কিছুদিন আগে আমি সংখ্যালঘু কমিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইনটা এখানে কি? আপনাকে থানায় নেয়া হলে আপনি যদি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জবানবন্দি নেয়া হবে। অন্যথা সন্দেহভাজক হিসেবে কোন রেকর্ডে আপনার নাম লেখা থাকবে। আপনার নাম তাহলে FIR-এ থাকবে। অথবা অন্য কোন তথ্য থাকবে। কিন্তু আপনাকে পুলিশ থানায় নিয়ে বলতে পারে না আপনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আপনি আমাকে চেনেনই না তারপরে আমাকে আটকে রাখলেন, আমার ওপর নির্যাতন করলেন অথচ এ ব্যাপারে কোথাও কোন এন্ট্রি রেকর্ড নেই। তারপর একদিন আমার সাথে আপনি জুড়ে দিলেন একজন অপরিচিত পাকিস্তানি লোককে। তারপর বললেন এরা দুজনই এক সাথে সন্ত্রাসী কাজ করে। এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম। তাই এখানে নিরাপত্তার নামে পুলিশ যা খুশি তাই করতে পারে। ক্রস ফায়ারে কেউ কেউ মারা যেতে পারে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এখানে কোন তদন্ত হবে না। আপনার ওপর সব সময় নজরদারি করা সম্ভব। যেমন ধরেন, আপনার ব্যাংক একাউন্ট তথা ব্যাংকের সব লেনদেন করতে হয় চেকের মাধ্যমে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বোম্বেতে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে যে, আপনি স্থাবর সমপ্তি বিক্রি করতে পারবেন না, বাসা ভাড়া দিতে পারবেন না। যদি বাসা ভাড়া দিতে চান তাহলে একজন পুলিশ অফিসারকে সবকিছু জানাতে হবে। এভাবে আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপি এটা চলছে।

উল্লেখ্য যে 'টাডা' আইনটা করা হয়েছিল যেটা ছিল নিষ্ঠুর ও অন্যায় তথাপি নিরাপত্তার নামে এটা করা হয়েছিল। মেনকা গান্ধির সেই ঘটনার পর কেউ এটার পক্ষে ছিল না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এটাকে সমর্থন করেছে, এবারও দোহাইটি ছিল নিরাপত্তা তথা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তারপর আসবে 'পোটা আইন' এবং সৈন্য বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। এই আইন দিয়ে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মনিপুর এলাকা ছারখার করে দিয়েছে। তারপরও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আমরা এটা সমর্থন করি। আমরা উদারতা, সামাজিক, ন্যায়বিচার সব কিছুই ভুলে গেছি। তাই আমাদের সবাইকে একথা মনে রাখা দরকার যে, এই বিশৃংখলাকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। তাহলে এখানে সমাধানটা কি? অস্ত্র, সহিংসতা এখানে কোন সমাধান নয়, কারণ সহিংসতার সমাধান কখনো সহিংসতা হতে পারে না। এখন আমাদের সমাজে এত সহিংসতা, এত সন্ত্রাস কেন হচ্ছে? এর পেছনে কারণটা কি? আর আমাদের সরকারকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে? না অস্ত্র দিয়ে, না এইসব নিষ্ঠুর আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের সমাজে এখনো অনেক বেশি অন্যায় অবিচার হয়, ভারতের সব জায়গায় অন্যায় হচ্ছে, বড় লোক আর ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা, তারা যা খুশি তাই করে কিন্তু তাদের কিছুই হয় না।

আমেরিকা যে কোন দেশকে দখল করতে পারে, আন্তর্জাতিকভাবে এর কোন প্রতিকার নেই। ভারতের বড় লোক আর ক্ষমতাবানরা কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা যা চায় তাই পায়। কিন্তু গরীব অসহায়দের নিয়ে আমরা অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি কিন্তু কোন লাভ পায়নি। উদাহরণ স্বরূপ নর্মদা বাঁধের কথাই ধরুন। তারা সবাই ঘরবাড়ি, জমি হারিয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলো এমনকি তাদের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে মুম্বাইতে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বসবাস শুরু করল। আমাদের সরকার ঐ বস্তিগুলো ভাঙছে। অথচ আপনার বাসস্থানের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একজন মানুষ হিসেবেও এটা আপনার মৌলিক অধিকার। আসলে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে একথা বলা হয়েছে

২০ নং আর্টিকেলে। মর্যাদার সাথে প্রাসঙ্গিক সব কিছুই আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন। আমাদের পোষাক, বাসস্থান, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শিক্ষা। কিন্তু আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করছি না যে, সরকার আসলেই কোন কাজ বা কোন দায়িত্ব পালন করছে না বরং ধীরে ধীরে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ কি করবে? যদি আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়, যদি আপনি আদালতে ন্যায় বিচার না পান, আপনি কি করবেন?

অন্ধ্র প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। বার বার তারা আদালতে আপিল করেছে। সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন, কিছুই করেনি। মানুষ এখানে কি করবে? তাদের উপায় কি হবে? এগুলোই এখন প্রশ্ন যার উত্তর নেই। মনে আছে একবার অরুন্ধতি রায় বলেছিলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যখন মানুষ ন্যায় বিচার পায় না, কোন সাহায্য পায় না, সে সময় তারা এসব অত্যাচারকে অস্বীকার করতে চায়। রায়টের পরে একবার গুজরাটে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট ছোট শিশুদেরকে দেখেছি যাদের মা বোনদের ধর্ষণের পর পুড়িলে মারা হয়েছে। কেউ তাদের গাইড করেনি, লেখাপড়া শেখায়নি, কেউ তাদের মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেনি। আতঙ্কটা তখনো ছিল। তারা কি ন্যায় বিচার আশা করতে পারে? আমি অস্ত্রধারণের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তবে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সরকার যদি ভুক্তভোগিদের সাহায্য না করে, তাহলে তারা নিজ থেকেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এটাই আসল কথা, অরুন্ধতি রায় যেটা বলেছিলেন, যখন ভুক্তভোগী হতে চায় না তাদের বলা হয় সন্ত্রাসী। আর এভাবেই আমরা বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের শিকার হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। আমাদের সরকারের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। তবে নিষ্ঠুর কোন আইন দিয়ে নয়, কোন একটা বিশেষ জাতীর উপর অত্যাচার চালিয়ে নয়, অবিচার করে নয়; বরং প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, জীবিকা এসব মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এইসব অধিকার যদি নিশ্চিত করা হয়, আপনা থেকেই এ সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে, এটুকু বলেই আমি আমার কথা এখানে শেষ করব। সকলকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : ধন্যবাদ বিচারক হস্‌বেট সুরেশ। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যে অন্যায়গুলো ঘটতে দেখি, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মতামতের জন্য। আপনি যেভাবে সত্যকে তুলে ধরলেন, সেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট উপকারে আসবে। এখন আমি আবার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল দর্শক শ্রোতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের মূল আলোচনার পর থাকবে উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তর। সেখানে আপনারা ডা. জাকির নায়েককে প্রাসঙ্গিক যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। পৃথিবীতে এখন সন্ত্রাস যে হারে বেড়ে গিয়েছে তাতে করে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ শান্তিকে ধর্ম আর রাজনীতিকে আলাদা করা কঠিন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের কারণে পৃথিবীর মানুষ আজ মুসলমানদের ভয় পায়, ইসলামকে ভয় পায়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আমরা সবাই একথাই ভাবি সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি? আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক যিনি একজন ডাক্তার এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের উপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বক্তা। তিনি গত ১০ বছরে পৃথিবী জুড়ে এক হাজারেরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি টিভি চ্যানেলে তার বক্তব্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আজকের আলোচ্য বিষয় "সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি?" বা সন্ত্রাসবাদের জন্য কি শুধু মুসলমানরাই দায়ী এখন বলবেন ডা. জাকির নায়েক।

সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি ? আলোচনা করছেন ডা. জাকির নায়েক

শ্রদ্ধেয় বিচারক হস্‌বেটে সুরেশ, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা এবং আমার একান্ত প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী সম্ভাষণে " আস্‌সালামু আলাইকুম" । আপনাদের ওপর দয়া শান্তি আর আশির্বাদ বর্ষিত হোক। আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো "বিশ্বে সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি" । প্রথমে আমরা বুঝার চেষ্টা করি 'সন্ত্রাস' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কি? সন্ত্রাস শব্দটাকে কোন সংজ্ঞা দেয়া খুবই কঠিন। এর অনেক সংজ্ঞা আছে যেগুলো পরস্পর বিরোধী। সংজ্ঞা জিনিসটা অনেকটা বায়বীয়, এটা বিভিন্ন সময় বদলায় আর বদলানোর কারণ ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হচ্ছে যে 'সন্ত্রাস' হল কোন হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করা বা কোন সরকারকে কোন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা। এই সন্ত্রাস শব্দটা প্রথমবারের মত ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭৯০-এর দশকে ফরাসী বিপ্লবের সময়। আর এই ১৭৯০-এর দশকে এডমন্ড বার্ক নামে বৃটিশ কূটনীতিক এই শব্দটা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সে সময়ে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন সরকারকে। ১৭৯৩ এবং ১৭৯৪ সালকে বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসের সময়কাল। ম্যাক্সমিলিয়ান রোবসপিয়ার ছিলেন এই সরকারের প্রধান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি তিন হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন, গিলেটিন চড়িয়েছিলেন। ইতিহাস বলে- রোবসপিয়ার তখন ৫ লক্ষাধিক মানুষকে আটক করে তন্মধ্যে ৪০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২ লক্ষাধিক মানুষের হয়েছিল নির্বাসন। আরো ২ লক্ষাধিক মানুষ জেলখানায় অনাহারে অত্যাচারে মারা গেছে। তাহলে বুঝা গেল 'সন্ত্রাস' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদেরকে বোঝানোর জন্য। আজকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বিশেষত পশ্চিমা মিডিয়ায় একটা বিবৃতি বার বার দেয়া হচ্ছে সেটা হল- সব মুসলমানই সন্ত্রাসী না, তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান। এই বিবৃতির এই কথা এখন ভারতেও চলে এসেছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালের ১১ জুলাই বোম্বেতে বোমা বিস্ফোরণের পর। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বোম্বেতে লোকজন এই কথাই বলছে বারবার। 'সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান।'

সন্ত্রাসের নেপথ্যের ইতিহাস

আসুন আমরা দেখার চেষ্টা করি ইতিহাস কি বলে? এই সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে কি তথ্য সংরক্ষিত আছে? উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এমন কোন সন্ত্রাসী হামলা খুঁজে পাব না যেটা মুসলমানরা করেছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে সবগুলো হামলার কথা বলতে পারব না; শুধুমাত্র কয়েকটার কথা উল্লেখ করব।

সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল অমুসলিমদের থেকে

আমরা জানি ১৮৮১ সালে রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি একটা বুলেট প্রুফ গাড়ীতে করে ঘুরছিলেন। তখন এক বোমা বিস্ফোরণে ২১ জন নিরীহ পথচারী মারা গেল। এরপর আরেকটা বোমা ফুটল এবং তিনিও মারা গেলেন। তাকে কোন মুসলমান হত্যা করেনি, তাকে হত্যা করেছিল ইগনেসি। বুলবুস্ক থেকে আসা একজন লোক। যে ছিল নৈরাজ্যবাদী ও অমুসলিম। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেখানে ১২ জন নিরীহ মানুষ, ৭জন পুলিশ এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা (নাম ডি জেন) মারা গিয়েছিল। এ কাজটা মুসলমানরা করেনি যারা করেছিল তারা নৈরাজ্যবাদী ৮ জন অমুসলিম। আর বিংশ শতাব্দীর হামলাগুলো লক্ষ্য করি- ১৯০১

সালে ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি তাকে 'লিওন' নামে এক নৈরাজ্যবাদী দুইবার গুলি করে হত্যা করেছিল এবং সে ছিল অমুসলিম। ১৯১০ সালের পহেলা অক্টোবর লস এঞ্জেলসে টাইম নিউজ পেপার (বিল্ডিং) ভবনে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানে ২১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এর জন্য যারা দায়ী তারা ছিল জেমস ও জোসেফ নামে দুই খ্রিস্টান। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আর্কডিউক ফ্রানজ, ফার্ডিন্যান্ড এবং তার স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর জন্য যারা দায়ী ছিল তারা 'ইয়ং বসনিয়া' নামে একটি দল যাদের অধিকাংশ ছিল সার্বিয়ান অমুসলিম। ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার 'সেইন্ট ন্যাডেলিয়া' চার্চে এখানে ১৫০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত হয়েছিল ৫০০ জনেরও বেশি। এটা ছিল বুলগেরিয়ার মাটিতে তখনো পর্যন্ত সব চেয়ে বড় সন্ত্রাসী আক্রমণ।

আর এ কাজটা করেছিল বুলগেরিয়ার 'কমিউনিস্ট পার্টি'। ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর যুগোস্লোভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডারকে 'ভ্লাদা জার্জিফ' নামে এক অমুসলিম বন্দুকধারী হত্যা করে। প্রথম যে বিমানটি ছিনতাই করা হয় সেটা কোন মুসলমান করেনি। কাজটা করেছিল 'ওরটিজ' নামে এক অমুসলিম ব্যক্তি। সে বিমানটি ছিনতাই করে কিউবায় নিয়ে যায় এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখি ১৯৬৮ সালের ২৮ আগস্ট গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজ অমুসলিম। ১৯৬৯ সালে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন জাপানী অমুসলিম। একই বছর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেছিল তাও একজন অমুসলিম। ১৯৯৫ সালে ১৯এপ্রিল হয়েছিল ওক্লাহোমা বোম্বিং। সেখানে বোমা ভর্তি একটা ট্রাব ওক্লাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে। মারা যায় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ, আহত হয় আরো কয়েকশ। প্রথম দিকে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল কাজটা করেছিল 'টিমোথি' ও 'টেরি' নামে ডানপন্থী দলের সমর্থক দুই খ্রিস্টান। এরা বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কিন্তু মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই আট বছরের মধ্যে ২৫৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে শুধুমাত্র ইহুদী সন্ত্রাসীরা। তাদের অনেকগুলো দল ছিল যেমন- ইরগুন, স্টার্নগ্যাং, হ্যাগানা ইত্যাদি।

সন্ত্রাসের হোতা ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী নোবেল পুরস্কার পেল কিভাবে?

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই কিং ডেবিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মেনাফেম বেগেন-এর নেতৃত্বে ইরগুন কর্তৃক এই বিস্ফোরণটা ঘটে। যেখানে ৯১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। তন্মধ্যে ২৮ জন বৃটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদী এবং অন্য আরো ৫ জন। এই ইরগুন গ্রুপ আরবদের ন্যায় পোষাক পরিধান করেছিল, যাতে লোকজন মনে করে আরবরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর এ ছিল বৃটিশ ম্যানডেটের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আক্রমণ। সেই সময়টাতে মেনাফেম বেগানকে বৃটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী কয়েক বছর পর তিনিই হলেন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কিছুদিন পর তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। চিন্তা করুন, যে মানুষটা খুনি, যে মানুষটা খুন করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে সেই প্রধানমন্ত্রী হয় ইসরাঈলের, কিছুদিন পর নোবেল পুরস্কার পায় শান্তিতে। আর তখন ইরগুন, হ্যাগানা, স্টার্নগ্যাং এইসব সন্ত্রাসী দলও তাদের নেতারা যেমন আইজেক রবিন, মেনাফেম বেগান, এরিয়েল শ্যারন

এরা সবাই পরবর্তীতে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ কোন কর্মকর্তা হয়েছিলেন এবং এরা সবাই যুদ্ধ করেছিল ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য। যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখেন, ১৯৪৫ সালের আগে ইসরাঈল নামে কোন দেশ ছিল না। এই ইহুদী দলগুলো, খোদ বৃটিশরা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ডাকত এরা একটা ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য লড়েছিল। পরে তারা শক্তি দিয়ে ইসরাঈল দখল করে প্যালেস্টাইনদের তাড়িয়ে দেয়। এখন এই লোকগুলোই প্যালেস্টাইনের লোকদেরকে বলছে..... (যাদের দাবীটা আরো বেশি জোরালো তাদের দেশ ফেরত চায়। এখন তাদেরকে সন্ত্রাসী বলছে এই ইসরাঈলীরাই)।

ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী বলা অযৌক্তিক

চিন্তা করুন, হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদী মেরে বের করে দিয়েছিলেন। তারা প্যালেস্টাইনে কেন যাবে? প্যালেস্টাইনীরাই তাদের জাতী ভাইদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা যদি দেশ চায় তাহলে তাদের জার্মানী অথবা ইউরোপ ফিরে যাওয়া উচিত। চিন্তা করুন যে প্যালেস্টাইনীরা তাদেরকে নিজ ভূমিতে স্বাগতম জানিয়েছিল তাদেরকেই তারা আজ সন্ত্রাসী বলছে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, আপনার বাসায় একজন মেহমান আসল। অচেনা সেই লোককে আপনি থাকতেও দিলেন। আর কিছুদিন পর সে আপনাকে বের করে দিল। তারপর আপনি দরজার সামনে দাড়িয়ে বলতে থাকলেন আমার ঘর ফেরত চাই। লোকে আপনাকে সন্ত্রাসী বলল, ঠিক এ ঘটনাই ঘটেছে। আজ ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে কি জন্য? তারা তাদের দেশটা ফেরত চায় এটাই তাদের অপরাধ? পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের/ উন্নত দেশগুলোর মানুষ নির্বিকারভাবে এ জঘন্য অন্যায় মেনে নিচ্ছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৬৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জার্মানীতে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

ইটালির 'রেগব্রিগেড' তারাও অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি ১৯৭৮ সালে তারা ইটালির প্রধানমন্ত্রী 'অ্যালডো মোর' কে অপহরণ করে ৫৫ দিন পর তাকে হত্যা করে। জাপানেও এরকম সন্ত্রাসী চক্র দল আছে। যেমন– দ্যা জাপানীজ রেড আর্মি, ওম শিন্‌রিফি ও বৌদ্ধ কাল্ট প্রভৃতি। তারা একবার নার্ভ গ্যাস দিয়ে টোকিও পাতাল রেলে হাজার হাজার মানুষকে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু ভাগ্য ভাল, তারা খুব একটা সফল হতে পারেনি। সেখানে মারা গিয়েছিল মাত্র ১২ জন। তবে গ্যাসের কারণে ৫৭০০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছিল। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা কেউ মুসলিম নয়। তারা সবাই বৌদ্ধ। ইংল্যান্ডে ১০০ বছরেরও বেশি সময় আই, আর, এস (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে খোদ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এরা সবাই ক্যাথলিক তবে তাদেরকে ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না, যদিও তারা অনেক সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। শুধু ১৯৭২ সালেই ৩টা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যার প্রথমটাতে ৭জন, দ্বিতীয়টাতে ১১ জন এবং তৃতীয়টাতে মারা গেছে ৯ জন।

১৯৭৪ সালে গিলফোর্ড বারে তারা আরো দুইটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যেখানে ৫ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর আহত হয়েছে ৪৪ জন। বার্মিংহাম বারে একই ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ১৮২ জন আহত হয়। ১৯৯৬ সালে তারা লন্ডনে বোমা ফাটায় যেখানে ২ জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এরপর তারা বোমা ফাটায় ম্যানচেস্টার শপিং সেন্টারে, যেখানে আহত হয় ২০৬ জন। ১৯৯৮ সালে ক্যামব্রিজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে একটা গাড়ীতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের একটা বোমা ছিলো, এ ঘটনায় আহত হয় ৩৫

জন। সেই একই বছর ৫০০ পাউন্ড ওজনের আরেকটি বোমা একটি গাড়ীতে বিস্ফোরিত হয়, যেখানে ২৯ জন নিহত ও ৩৩০ জন আহত হয়েছিল। আর এই রেকর্ড বিবিসি, সিএনএন, অ্যামনেস্টির মত অমুসলিম মিডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত। তবে অনেক সময় সংখ্যাটা মিডিয়ার তথ্য সন্ত্রাস কখনো বেশি কখনো কিছুটা কম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন একটা প্রতিবেদনে জানতে পারলাম মারা গেছে ২৯৬ জন। আবার অন্য এক তথ্যে ২৯৩ জন। তাই আমি বললাম ২৯০ জনেরও বেশি। ২০০১ সালে আইআরএ বিবিসি-তে বোমা ফাটাল কিন্তু আইআরকে কখনোই ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না। আজকে ইংল্যান্ড সরকার খুব বেশি ভয় পাচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসীদের। আমি ঠিক জানিনা এ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের ইতিহাসে কতগুলো বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে মুসলমানরাই এগুলো করেছে। এমনকি ২০০5 সালের ৭ জুলাই লন্ডনের সেই বোমা বিস্ফোরণের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই এতদ্বসত্ত্বেও সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলমানরা এটা ঘটিয়েছে। সেখানে ৫০ জনের বেশি মারা গেছেন। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম মুসলমানরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারপরেও এটা আইআরএ-এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তথা বিস্ফোরণের ধারে কাছেও না। তারা হাজার হাজার মেরেছে তারপরেও ইংল্যান্ড সরকার ভয় পায় মুসলমানদের। আইআরএ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আছে; কিন্তু বুশের উপদেশের কারণে টনিব্লেয়ার মুসলমানদেরকেই বেশি ভয় পায়। ১০০ বছরের পুরাতন আইআরএ যেন কোন সমস্যাই নয়।

আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি ফ্রান্স আর স্পেনে সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম 'ইটিএ'। তারা এ পর্যন্ত ৩৬টি আক্রমণ চালিয়েছে। আফ্রিকায়ও অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তার মধ্যে প্রধান কুখ্যাত দলগুলোর একটা হল "লর্ডস্ সালভেশন আর্মি"। এটা একটা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা বাচ্চাদেরকেও সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আর শ্রীলংকার এলটিটি-র কথা আপনারা শুনে থাকবেন। তামিল টাইগারস এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠগুলোর মধ্যে একটি। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী বোমার ব্যাপারেও যথেষ্ট দক্ষ। এমনকি তারা বাচ্চাদের (রেড ডেভিল) কে কাজে লাগায় প্রশিক্ষণ দেয়; আত্মঘাতী হামলা ঘটায়।

তামিল টাইগারদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

সাধারণভাবে আমরা ফিলিস্তিনী ও ইরাকী আত্মঘাতী হামলাকারীর কথা শুনে থাকি; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যারা আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে তারা হলো- এলটিটিই বা তামিল টাইগারস। এরা হিন্দু কিন্তু ভারতের সাংবাদিকরা তাদেরকে হিন্দু সন্ত্রাসী বলে না; বলে এলটিটিই। ভারতে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী আক্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয় কাশ্মীরী বিদ্রোহের কথা। সেটা ঠিক বা বেঠিক তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে কতবার আমরা শুনতে পাই....... বিচারক সুরেশ নিজেই ভারতে ঘটা অনেকগুলো সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলেছেন। আমি ঠিক জানিনা এই আক্রমণের কতগুলোর কথা আপনারা খবরে পড়েছেন, সুরেশের মত মানুষ যারা এ অঙ্গনে আছে তারা জানে। কিন্তু জনসাধারণ এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা। যখন কোন সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলা হয়, বেশিরভাগ সময়ে লোকজন বলে মুসলমান সন্ত্রাসীদের কথা অথচ ভারতে প্রায় সবগুলো ধর্মের মানুষের সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। আমরা শিখ সন্ত্রাসীদের বিন্দ্রানওয়ালা গ্রুপের কথা জানি। ভারতের সরকার ১৯৮৪ সালের ৫জুন পাঞ্জাবে শিখদের স্বর্ণ মন্দিরে আক্রমণ করে এবং দখল করে। সেখানে ১০০ জন মানুষ মারা যায়।

প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে তার একজন নিরাপত্তা রক্ষী যে ছিল শিখ। আপনি যদি অমুসলিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদের ওয়েবসাইটে যান, সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা দেখতে পাবেন, সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বা অবদান খুবই কম। তবে মিডিয়া বা গণমাধ্যমে এটা যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। যেমন– এটিটিএফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স), এনএলএফটি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা) প্রভৃতি এরা অনেক হিন্দু মেরেছে। ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর ৪৪জন হিন্দু মারা যায় এবং অনেকে আহত হয় এদের আক্রমণে। আসামে 'উলফা' এরা একাই ১৯৯০-২০০৬ পর্যন্ত গত ১৬ বছর সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়ার মাটিতে ৭৪৯টি আক্রমণ চালিয়েছে। ৭৫৯টি নিশ্চিত সন্ত্রাসী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে শুধু কাশ্মীরদের আক্রমণই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাকে প্রায়ই বলা হয় ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার জন্য। কাশ্মীর থেকে আমাকে বহুবার বলা হয়েছে, তবে যাব কিনা এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঠিক করলাম সেখানে যাব। অবশেষে সেখানে গেলাম এবং শ্রীনগরে একটা বক্তৃতা দিলাম। সেখানে লোকজন আমাকে জানাল যে গত ১৪ বছরে সরকার এই প্রথম কোন বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিল। কাশ্মীরের পোলো গ্রাউন্ডে আমার বক্তৃতা অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ এসেছিল অশান্ত অবস্থাতে। সরকার আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। আমিও ভাবলাম- মেশিনগান হাতে এই লোকগুলো আমার সাথে কেন? আমি সেখানে গুলমার, পেহেলগা, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলাম। আমার মনে হয়নি আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। এরপর আমি আসামে গেলাম বক্তৃতা দিতে। সেখানে বিমান বন্দরে নামার সাথে সাথেই দেখলাম চারপাশে নিরাপত্তা রক্ষী। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম, সেখানে নিরাপত্তা না থাকলে আমি এখানে আসতে পারতাম না।

সন্ত্রাসী সংগঠন প্রজনন কেন্দ্র আসাম

আমি জানতাম না আসামে এত সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। উলফাদের ট্রেনিং দেয়া হয় শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে মারার জন্য। তারা সবাই হিন্দু, মিডিয়ায় এদের নিয়ে কতবার রিপোর্ট হয়েছে; কিন্তু কতজন সেটা খেয়াল করে। কারণ সেটা প্রধান শিরোনাম ছিল না বরং ছোট খবর ছিল। এ দেশের অন্য একটি সন্ত্রাসী দল নকশালপন্থীদের ও মাওবাদীদের কথা আমরা জানি। মাওবাদিরা কমিউনিস্ট। আর ভারতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশিরভাগই করেছে মাওয়িটরা, শুধু নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে (ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী) প্রায় ১৫০টি জেলার মাওয়িটরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এক তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ পর্যন্ত যত মানুষ মেরেছে, যতগুলো আক্রমণ করেছে, কাশ্মীরের সাথে তুলনা করলে কোন তুলনাই করা যাবে না। তারা ভারত সরকারের জন্য অনেক বড় হুমকি। তারপরও দেখি আমরা, সরকার অনেক বেশি চিন্তিত মুসলমান সন্ত্রাসীদের নিয়ে। এর কারণ হল বুশ, কয়েক দিন আগে ৯ই সেপ্টেম্বর টাইমস অব ইন্ডিয়ায় একটা খবরে এসেছে, ৮৭৫টি রকেট গোলা বারুদের একটা ভাণ্ডার যেগুলো মাওয়িটদের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, পুলিশ এগুলো আটক করে এবং বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে ৩০টি রকেট লাঞ্চার ছিল।

এখন চিন্তা করুন এটা ভারতের ইতিহাসে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্রের চালান। যেটা সরকারের কাছে ধরা পড়েছে। চিন্তা করুন, ৮৭৫টি রকেট লাঞ্চার যা দিয়ে ইন্ডিয়ার আর্মির সাথেও যুদ্ধ করা যেতে পারে। এই ঘটনায় অন্দ্র প্রদেশের ডিজিপি হতবাক হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই রকেট লাঞ্চার দিয়ে তারা যে কোন থানায় হামলা করতে পারে। কোন ট্যাংক ঘায়েল করতে পারে ৬০০ মিটার দূর থেকে। অর্ধ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে তারা ইন্ডিয়ান ট্যাংক বা থানায় হামলা করতে পারে। এতে আমাদের কিছুই করার থাকে না। এত কিছুর পরেও মানুষ ভয় পায় কাদের? যাদের দাঁড়ি আছে, যারা টুপি পরে, যারা প্যান্ট গোড়ালির উপর পরে, আসলে তারা রকেট লাঞ্চারের চেয়েও বিপদজনক? কেন? কেন এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে? এর উত্তর হলো এ কাজটি করছে পশ্চিমা মিডিয়া। কারণ মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি ও কূটনীতিবিদরা। আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বলা যায় যে, সন্ত্রাস শুধুমাত্র মুসলমানদের সম্পত্তি নয় এবং এই সন্ত্রাসের ব্যাপারে মুসলমানদের তেমন বিশেষ কোন ভূমিকা বা কৃতিত্ব নেই। ইসলামে এটার অনুমোদন দেয়া হয়নি, শুধু তাই নয় ইসলামে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে।

আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে একথা বলতে পারব না যে, সব ধর্মই বলে– আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করবেন না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থগুলো পড়লে যেটা পাবেন সেটা হল নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়। আর এই সবগুলো ধর্মের লীডার বা প্রধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম বলছে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে, শুরুতেই যে আয়াতের তেলাওয়াতে আপনারা শুনেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে- "যদি কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।" অর্থাৎ, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক কোন মানুষ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন পুরা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করল। আমি অনেক ধর্মগ্রন্থের কথা জানি সেখানে বলা হয়েছে– নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়।

কুরআন বলছে, যদি কেউ অন্য কোন মানুষকে হত্যা করে আর সেটা যদি হত্যাকান্ডের অপরাধ অথবা দুর্নীতি বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয় তাহলে সে যেন পুরা মানবজাতিকে হত্যা করল। কুরআন এখানে এক ধাপ এগিয়ে বলেছে কারণ আমি এমন কোন ধর্ম গ্রন্থের কথা জানিনা যেখানে এ কথা বলা হয়েছে– "নিরীহ মানুষকে হত্যা করা পুরা মানবজাতিকে হত্যার শামিল। কোন মানুষের জীবন বাঁচানো সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচানো। ইসলাম 'সিলম' থেকে নির্গত যার অর্থ– আত্মসমর্পণ করা, এক কথায় ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ ২টা। শান্তি ও আত্মসমর্পণ। সামগ্রিক অর্থে ইসলাম শব্দের অর্থ- নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ তথা নিজেকে আত্মসমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে তীব্র নিন্দা করে এবং জোরালো নিষেধ করে। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার আক্রমণ, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণে ৫০ জন নিহত, নিউইয়র্ক টাওয়ারে (৩০০০) তিন সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু, ১৯৯৩ সালে বোম্বেতে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণে ২৫০-এর অধিক মানুষের প্রাণহানি, সম্প্রতি ২০০৬ সালের ১১ জুলাই বোম্বেতে ২০০ মানুষের প্রাণহানি এ সবগুলোই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। নিরীহ মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। অনেক মুসলমান অনেক সময় এসব কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে, থেমে যায়; কিন্তু আমি থামব না; বরং বলেই যাব। আমি অবশ্যই নিন্দা

করব আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, গুজরাটে যে সমস্ত মানুষ মারা গেল এই জঘন্য কাজে, আমরা এখানে এভাবেই থেমে যেতে পারিনা। যদিও আমরা জানি কোন ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করার অনুমোদন দেয় না। আজ আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? যেখানে অহরহ নিরীহ মানুষ মারা যায় এ ধরনের সকল সন্ত্রাসের নিন্দা করা উচিত, চাই সেটা মুসলমানরা করুক বা অমুসলিমরা করুক। আমাদের কাছে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে, ১১ সেপ্টেম্বর অথবা ৭জুলাই অথবা বোম্বে ট্রেনে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এই কাজগুলো মুসলমানরাই করেছে। এটা শুধুমাত্র একটা অনুমান। তবে সেখানে যাই হোক এবং যে কেউ এটা করুক না কেন এর নিন্দা করা উচিত। কারণ এসবই নিষিদ্ধ। কোন ধর্ম এগুলো অনুমোদন দেয় না।

সন্ত্রাস কোন ধর্মে একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সন্ত্রাসীরা কোন না কোন ধর্মের অনুসারী কারণ সব ধর্মে সন্ত্রাসী আছে। খ্রিস্টান সন্ত্রাসী আছে, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী আছে, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এভাবে বিভিন্ন ধর্মে সন্ত্রাসী আছে। তবে বেশির ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে সর্বদা নিন্দা করে। যদি আমরা জরিপ করে দেখি, কোন মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে, তারা কোন ধর্মের অনুসারী? এক নম্বর পৃথিবীর যে লোকটা সবচেয়ে বেশি নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তিনি কে? তিনি হিটলার যিনি গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে মেরেছে, আর পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছে প্রায় ছয় কোটি মানুষ। সে কি মুসলমান ছিল? সে একজন খ্রিস্টান।

জোসেফ স্ট্যালিন ২ কোটি মানুষকে মেরেছিল এবং তার নির্দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। এবার চায়নার দিকে দেখুন, মাওসেতুং চীনে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে, এদের কেউই মুসলমান নয় সবাই অমুসলিম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসোলীনি শুধুমাত্র ইটালীতেই প্রায় ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। যার নামে ফরাসী বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে সেই 'ম্যাক্সমিলিয়ান রোব্‌স্‌পিয়ার' তার অত্যাচারে ও নির্যাতনে মারা গেছে ২ লক্ষের বেশি মানুষ। আপনারা জানেন 'অশোক' শুধুমাত্র কলিঙ্গের কেটা যুদ্ধেই হত্যা করেছিল এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন প্রশ্ন হল সেকি মুসলমান ছিল? না সে তো ছিল হিন্দু। আমাদের ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে, যেমন– সাদ্দাম হোসেন, সে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, কিন্তু শুধুমাত্র ইরাকের উপর আমেরিকা জাতিসংঘ ও জর্জ বুশের একটা নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু ইরাকেই একটি আঘাতে মারা গেছে ৫০ হাজার শিশু।

ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তবে হিটলারের তুলনায় বা আঙ্কেল জো, জোসেফ স্ট্যালিন, ও মাওসেতুং-এর তুলনায় এটা কিছু না এবং এদের প্রত্যেকের কাছেই মুসলমানদের সবগুলো হত্যাকাণ্ড একবারে নগণ্য। আমি একথা বলছি না যে, তারা সবাই তাদের ধর্ম মেনে চলতো। আসলে তারা কেউই ধার্মিক বা তাদের স্ব স্ব ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ছিল না। যদি তাই হত তাহলে তারা কখনোই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারত না। এরপরে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলমানদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। তাদেরকে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলা হচ্ছে। এই 'মৌলবাদী' শব্দটার অর্থ কি? মৌলবাদী, শব্দটার অর্থ হলো- "যে মানুষ কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের মূলনীতি অনুসরণ করে।" উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ ভাল বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। যদি সে বিজ্ঞানের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে ভাল বিজ্ঞানী হতে পারবে না। যদি কেউ ভাল গণিতজ্ঞ হতে

চায়, তাকে সে ক্ষেত্রে গণিতের মূলনীতি ভালভাবে অনুসরণ করতে হবে। গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হওয়া পর্যন্ত সে ভাল গণিতজ্ঞ হতে পারে না।

আপনি ঢালাওভাবে বলতে পারেন না মৌলবাদীরা সবাই ভাল অথবা সবাই খারাপ। একটা মানুষ কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর বলা উচিত। যদি কেউ মৌলবাদী ডাকাত হয়, যার কাজ হল ডাকাতি করা। সে সমাজের জন্য খারাপ, পক্ষান্তরে কেউ যদি মৌলবাদী ডাক্তার হয় যে হাজারটা মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে, সে সমাজের জন্য কল্যাণকর। তাই একটা মানুষ যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর আপনি ভালো-খারাপ বলতে বা মূল্যায়ন করতে পারেন। আমি এখানে আমার কথা বলতে পারি আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান। যে জন্য আমি গর্বিত। কারণ আমি (সাধ্যমত) ইসলাম ধর্মের সব মূলনীতিই মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটা নীতিও মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে না। তবে এমনটা হতে পারে যে, ইসলামের কিছু মূলনীতি অমুসলিমদের কাছে মানবতা বিরোধী মনে হতে পারে; কিন্তু আপনি যদি ইসলামের সেই মূলনীতিগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে একটা নিরপেক্ষ মানুষও পাবেন না, যে বলবে– ইসলামের মূলনীতিগুলো মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে।

মৌলবাদ

এই 'মৌলবাদ' শব্দটা 'অক্সফোর্ড' অভিধানে পাবেন। এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বুঝানোর জন্য। সেটা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আমেরিকায় যারা চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল। তাদেরকে বলা হয় প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান বা প্রতিরোধকারী খ্রিস্টান। তারা প্রথম দিকে চার্চে বিশ্বাস করত যে, বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু পরে তারা আপত্তি জানিয়ে বললো– শুধুমাত্র বাইবেলের কথাগুলোই ঈশ্বরের নয়; বরং প্রত্যেকটা শব্দই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। এটা একটা ভাল বা ইতিবাচক আন্দোলন। অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি তাহলে সেই অন্দোলনটা ভালো নয়। অক্সফোর্ড অভিধানে 'মৌলবাদ' শব্দটার অর্থ বলা হচ্ছে– মৌলবাদী হল একজন ব্যক্তি, যে কোন ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে। তবে অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণে পরিবর্তন হয়েছে, নতুন সংস্করণ বলছে যে মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি যে কোন ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদকে কঠোরভাবে মেনে চলে, বিশেষ করে ইসলাম। শেষোক্ত 'বিশেষ করে ইসলাম' এটা নতুন করে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

যখনই 'মুসলমান' শব্দটা শুনবেন আপনি ভাববেন সে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী। অনেক মুসলমানকেও বলতে শুনবেন, আমি মৌলবাদী বা চরমপন্থী না। কিন্তু আমি বলছি– আমি চরমপন্থী, অর্থাৎ আমি চরমভাবে সৎ, চরম ন্যায়পরায়ণ, চরম দয়ালু, চরম শান্তিকামী ও চরম ক্ষমাশীল। আমি জানি না এগুলোর মধ্যে অপরাধ কি? তবে উহা মাঝে মধ্যে হলে চলবে না। যখন আপনার সুবিধা হবে তখন ন্যায় পরায়ণ হবেন আর সুবিধা না হলে বা না থাকলে হবেন না সেটা হতে পারে না। আপনার চরম ন্যায়বান হতে হবে। আংশিক বা সাময়িক চরম ন্যায়বান হলে চলবে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ মহান আল্লাহর বাণী কুরআনও সেটাই বলে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমি পৃথিবীর সব মানুষকে প্রশ্ন করতে চাই কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন চরম সৎ হওয়া, চরম ন্যায়বান চরম শান্তিকামী হওয়া অন্যায়। আমাদেরকে চরমপন্থীই হতে হবে। চরমপন্থী মুসলমান হতে হবে। সেটাই হবে

সঠিক পথ। চরমপন্থী হলে আমি একজন ভালো, সত্যিকার মুসলমান হতে পারব। আমি জানি এই শব্দটার এখন ভিন্ন অর্থ করা হচ্ছে। সংজ্ঞা সব সময়ই বদলাতে থাকে।

সুতরাং কুরআনকে আংশিকভাবে মানলে চলবে না, চরমভাবে ও পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً .

"তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।"

আজকে মুসলমানদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সহজ সাধারণ সংজ্ঞা হল যে লোক অন্যকে সন্ত্রস্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন অপরাধী পুলিশকে দেখলে সন্ত্রস্ত বোধ করে তাহলে এই অপরাধীর জন্য পুলিশ হলো সন্ত্রাসী। এভাবে দেখলে আমি বলব প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। যখনই কোন অপরাধী, কোন ধর্ষক, কোন ডাকাত কোন মুসলমানকে দেখবে সে সন্ত্রস্ত হবে। আর এ কথাই বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সূরা আনফাল-এর ৬০ নং আয়াতে–

"যারা আল্লাহর শত্রু তাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখার জন্য তোমরা সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের অস্ত্র ও গৃহপালিত পশু প্রস্তুত রাখ।"

যারা মানবতার বিরুদ্ধে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলছে তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি কর। আমি জানি সাধারণ অর্থে 'সন্ত্রাস' শব্দটার অর্থ নিরীহ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। কোন মুসলমানেরই উচিত না নিরীহ মানুষকে হত্যা, ভীত-সন্ত্রস্ত করা। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। ৬০ বছর আগে ভারত যখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত, তখন বৃটিশ সরকার তাদেরকে সন্ত্রাসী বলত। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা তাদেরকে বলি মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। একই লোক একই কাজ কিন্তু দুইটা আলাদা বিশ্লেষণ। যদি আপনি বৃটিশ সরকারের সাথে একমত হন তাহলে আপনি এই লোকগুলোকে বলবেন সন্ত্রাসী, পক্ষান্তরে আপনি যদি সাধারণ ভারতীয়দের সাথে একমত হন যে, বৃটিশরা ভারতে ব্যবসা করার জন্য এসেছে আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই। তাহলে আপনি এদেরকে বলবেন দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা। এই বৃটিশ সরকার তারা ভগবতসিং, চন্দ্রশেখর, আজাদ, সুভাষচন্দ্র বোসকে বলে সন্ত্রাসী। আমরা সেটা মানি না। শুধু বৃটিশ আমেরিকানরা বললেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তারা যুদ্ধ করেছিল সুবিচারের জন্য, তারা ছিল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, আপনি যদি কোন মানুষকে কোন বিশ্লেষণ দিতে চান, তাহলে আপনাকে আগে খুঁজে দেখতে হবে যে, কোন উদ্দেশ্যে সে এই কাজ করেছে? আপনাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দেই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তথা ১৮৭৫ সালে আমেরিকান বিপ্লবের সময় আমেরিকানরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল।

আর যে লোকগুলো যুদ্ধ করছিল তাদেরকে বৃটিশ সরকার তখন বলতো সন্ত্রাসী। এ স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন (বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জর্জ ওয়াশিংটন) বৃটিশ সরকার যাদেরকে এক নম্বর বা শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করত। পরবর্তীতে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। উল্লেখ্য যে, একই মানুষ যিনি ছিলেন এক নম্বর সন্ত্রাসী পরে তিনিই হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর তিনিই হলেন জর্জ বুশসহ আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের-গড ফাদার। চিন্তা করুন এই একই লোককে বৃটিশ সরকার এক সময় বলেছে সন্ত্রাসী। তারা এখন মিত্র বন্ধু। সময়ের সাথে, ইতিহাসের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, ভৌগোলিক অবস্থার ভেদে সব কিছু বদলায়। এক

কথায় আমরা বলতে পারি যে, যে বা যারাই ক্ষমতায় বসে তারা যে কথাটা বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়। আজকে আমেরিকাই পৃথিবীর প্রধান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সকল পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম সব তাদেরই। তারা যদি কাউকে সন্ত্রাসী বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়, এটাই বাস্তবতা।

২০০১ সালের ডিসেম্বরে নাইন-ইলেভেনের ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। একটা বক্তৃতার বিষয় ছিল "ইসলামের আলোকে জিহাদ এবং সন্ত্রাস"। সেখানে আমার কাছে প্রথমে যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা করেছিল আমেরিকার কনসাল জেনারেল পার্থে। তার প্রথম প্রশ্নটা ছিল ডা. নায়েক, আপনার কি মনে হয় ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী? আমি তাকে বললাম লাদেনের ব্যাপারে আমি জানি না, কখনো দেখা হয়নি, কথা হয়নি, জিজ্ঞাসাবাদও করিনি। সে আমার বন্ধুও নয়, আমার শত্রুও নয়। শুধু বিবিসি, সিএনএন এর বিভিন্ন রিপোর্ট অথবা প্রতিবেদন শুনে আমি উত্তর দিতে পারব না। যদি বিবিসি, সিএনএন শুনে এর উত্তর দিতে চান, তাহলে আপনাকে বলতেই হবে যে, সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে আছে– إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ۔

"তোমাদের কাছে যদি কোন বার্তা আসে, তাহলে সেটা যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও।"

আর সে জন্য লাদেনের কথা যদি বলতে হয়, আমি নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারব না যে, সে একজন সন্ত্রাসী। বিবিসি, সিএনএন- থেকে আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ইরাকে হাজার হাজার বেসামরিক নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটেছে। ধরে নিলাম নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ওসামা বিন লাদেনই করেছে, যেমনটি নিছক অনুমান ভিত্তি করে বলে থাকে। যখন আফগানিস্তানের সরকার প্রমাণ চাইল জর্জ বুশ প্রমাণ দেখালেন টনি ব্লেয়ার, মোশাররফকে। ধরেন তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম লাদেনই এটা করেছে। কিন্তু এজন্য কি আপনি হাজার হাজার বেসামরিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন? সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্দী বিনিময় প্রথা থাকে। যেমন ধরেন, একজন লোক দেশে অপরাধ করে অন্য দেশে পালিয়ে গেল, তখন উক্ত আইনের আওতায় তাকে ফিরিয়ে আনা যায়। ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বন্দী বিনিময় প্রথা চালু আছে। কয়েক বছর আগে সিনেমার একজন সংগীত পরিচালক নাদিম একটা হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত হলে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যায়। ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বন্দী বিনিময় প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও যখন নাদিমকে চাওয়া হল, তারা বললো "আগে প্রমাণ কর সে অপরাধী।"

ভারত থেকে অনেক লোক, ভারতীয় পুলিশ, আইনজীবিরা সেখানে গেছে; কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। আমরা জানি ভূপাল গ্যাস ট্র্যাজেটিতে হাজার হাজার ভারতীয় মারা গিয়েছিল। আর ইউনিয়ন কার্বাইডের লোকেরা আমেরিকায় চলে গেছে। এখন ভারত সরকার কেন তাদের দাবী করে আমেরিকায় আক্রমণ করছে না? কারণটা কি? এটাতো প্রমাণিত যে ইউনিয়ন কার্বাইডে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে।

আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও আজীবন পঙ্গু হয়ে গেছে অনেকে। অনেকের পরিবার শেষ হয়ে গেছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এখনো তো বন্দী বিনিময় প্রথা আছে তারপরেও কিছুই হচ্ছে না। এখন আফগানিস্তান আমেরিকার মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা নেই। তারপরও মেনে নিলাম ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে। তার জন্য আপনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে তো মারতে পারেন না। সেখানে প্রায় ৩-৫ হাজার আফগানী মারা গেছে। তারপর

রাসায়নিক অস্ত্র অনুসন্ধানের অজুহাতে ইরাকে গেল এবং আক্রমণও করল, কিন্তু আক্রমণের পরেও সেখানে কিছুই পেল না। তারপরেও এখন ইরাক শাসন করছে তারাই। ইরাকের মানুষ এখন অনেক কষ্টে আছে। সাদ্দামের সময়েও তারা কষ্টে ছিল কারণ সাদ্দাম ভাল মুসলিম ছিল না, সে ইসলাম মানতো না। তার পক্ষে বলছি না; কিন্তু ইরাকের মানুষ সেই সময়ের চাইতে এখন আরো বেশি কষ্টে আছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হল 'তেল'। এটা একটা 'ওপেন সিক্রেট' তা সর্বজন বিদিত গোপন বিষয়। তাই আমি আমেরিকার কনসাল জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে সেই সময়েই বলেছিলাম আমার মতে পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ। আমি প্রায়ই বিভিন্ন বক্তব্যে বলে থাকি। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে একবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম। এটা তখন পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয়েছিল যে, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি মৌলবাদী এবং বুশ এক নম্বর সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদের আসল পরিচয়

আমি এমন কোন বক্তার কথা জানি না, যে জনসমক্ষে জর্জ বুশকে এক নম্বর সন্ত্রাসী বলেছেন। আমার জানা মতে নেই, তবে থাকতেও পারে। আর আজকে এটা খুবই কমন, আমি নিজেই প্রায় একশত বিখ্যাত লোকের কথা বলতে পারব। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচারক হসবেট সুরেশও এমনই মনে করেন। আমি জানতাম না। আসলে তিনি ন্যায় বিচারক। আমি জানি না তিনি কবে কোথায় প্রথম একথা বলেছিলেন। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ। তিনি বলেছেন- "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ।" বিখ্যাত গায়ক ও আমেরিকার সমাজকর্মী হ্যারি বল ফন্ট বলেছেন- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। ইংল্যান্ডের একজন এমপি জর্জ গ্যালওয়ে ও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন- "জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার এই দুইজনের হাতে যত পরিমাণ রক্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষের রক্ত রয়েছে লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণকারীদের হাতে।" তিনি আরো বলেছেন, "কোন আত্মঘাতী হামলাকারী যদি টনি ব্লেয়ারকে মেরে ফেলে এবং এতে যদি কোন নিরীহ মানুষ মারা যায় তাহলে এতে কোন অপরাধ হবে না। ভারতের জ্যোতিবসু এই কয়েক মাস আগে যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন- "এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ।" সবাই বলছে ভারত সরকার কেন জর্জ বুশকে আমন্ত্রণ জানায়? কি জন্য? সন্ত্রাসের কৌশল শেখার জন্য? সম্প্রতি কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল, নোবেল বিজয়ী বেটি উইলিয়াম বলেছেন- "বুশকে খুন করতে তার ভালই লাগবে।" জর্জ বুশকে মারতে পারলে তিনি খুশি হবেন। এখানে আমার মত ভিন্ন।

মৃত্যু নয়, বরং হেদায়াত কামনা উচিত

একবার লন্ডনে "জেহাদ এবং সন্ত্রাস" বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলাম, বক্তব্য শেষে এক তরুণ বললো, "আল্লাহু আকবর আমি বুশের মৃত্যু চাই। সেখানে অনেক অমুসলিম শ্রোতাও ছিলেন। আমার এতক্ষণের বক্তব্য ম্লান হয়ে গেল। সেই ছেলেকে বললাম, যদি আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইতিহাস দেখেন, তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, তখন দুজন ওমর ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। নবীজী দোয়া করলেন তাদের দুজনের মধ্যে একজনকে কবুল করুন, যাতে তারা ইসলামকে সাহায্য করে। এর কিছুদিন পরেই ওমর ইবনুল খাত্তাব মুসলমান হয়েছিলেন। আমি এভাবেই আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, অন্ততপক্ষে আল্লাহ জর্জ বুশকে হেদায়েত করুন। অথবা যে কোন একজনকে, চিন্তা করুন জর্জ বুশ টনি ব্লেয়ার ইসলামের উপর কত অত্যাচার চালিয়েছে তারা যদি হেদায়েত পায় তাহলে কি হবে?

আমি একজন দায়ী বা আহ্বানকারী

এ কাজই আমি করে আসছি। ইসলামের ভাল জিনিসগুলো বুঝানোই আমার দায়িত্ব। ইসলামের ভালো জিনিসটা তাকে বোঝাতে পারব না কেন? অনেকে আমাকে বলে আপনি পৃথিবীর অনেক জায়গায় যান, আপনার কি সমস্যা হয় না? আল্লাহর শুকরিয়া তাঁর অপার অনুগ্রহে আমি কখনোই সমস্যায় পড়েনি। আমি জানি যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান তারা অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন, যদিও আমার মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে কোট এই পোষাকেও কোন সমস্যা হয় না। আমার পোষাক পরিচ্ছদ এটা হচ্ছে আমার টার্গেট বা লক্ষ্য। আমি বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে সময় কাটিয়েছি। নাইন-ইলেভেনের দু'দিন আগেই একবার নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। সেখানে ২ সপ্তাহ ছিলাম। দুর্ঘটনাস্থলে থাকলে সম্ভবত আমাকে আটক করা হত; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরপর গেলাম লন্ডনে। ২০০৩ সালে একটা "অ্যাওয়ার্ড নিতে লস্‌এঞ্জেল্‌সে গেলাম। আমি আগেই জানতাম আমাকে আমার পোষাক সম্পর্কে ইমিগ্রেশনে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাই আমি মানষিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তারা বললো, তুমি কেন এসেছো? বললাম, পুরস্কার নিতে। কিসের জন্য পুরস্কার? তুমি কোন দাতব্য সংস্থায় কাজ কর? কি পুরস্কার পাবে তুমি? বললাম মানুষকে সেবা করার জন্য।

জিহাদের আহ্বান শুধু কোরানেই নয় বাইবেলেও রয়েছে

যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "সত্য কথা বল আর সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে।" আমিও সত্য কথা বলি এজন্য পুরস্কার পাচ্ছি তারপর আমরা অনেক কথাবার্তা বললাম, এরপর আমি কাস্টমসে গেলাম। আর ইচ্ছে করেই বললাম, আমি একটা ইসলামী সম্মেলনে এসেছি। ইসলামী সম্মেলন! এখনি চেক কর, তারা আমার ব্যাগ খুললো, প্রথমেই আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখলো "সন্ত্রাস এবং জিহাদ"। আর ক্যাসেটের কভারে একটা পিস্তল। তখন কাস্টমস অফিসার বলল, তুমি কি জিহাদে বিশ্বাস কর? বললাম হ্যাঁ আমি জিহাদে বিশ্বাস করি, এমনকি যীশু খ্রিস্ট ও জিহাদে বিশ্বাস করতেন, চেষ্টা করা আর সংগ্রাম করায়। না, না, না তুমি কি যুদ্ধে বিশ্বাস কর? আমি বললাম। যদি বাইবেল পড়ন তাহলে বাইবেলেও যুদ্ধের কথা পাবেন, বুক অব আম্বারসে পাবেন ৪১ নং অধ্যায়ের ১-১৯ অনুচ্ছেদ, বুক অব এক্সোডামের ২২ নং অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে, বুক অব এক্সোডামের ৩২ নং অধ্যায়ের ২৭-২৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। যীশু তাঁর নিজের মুখেই বলেছেন, লুক অব গসপেল ঃ অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ-৩৬ এ "তলোয়ার হাতে নাও এবং যুদ্ধে যাও।"

আর তখনই ৮/১০ জন কাস্টমস অফিসার সেখানে জড়ো হয়ে গেল। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করল স্যার! আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? তখন আমি মোবাইলে আমার লোকজনদেরকে বললাম চিন্তা করবেন না একটু আটকে গেছি, দাওয়াত দিচ্ছি। আশাকরি সমস্যা হবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে অনেক সফর করেছি। আল্লাহর দয়ায় সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া কোন সমস্যায় পড়িনি। আমি জানি আমার অনেক সহকর্মী যারা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়ে সমস্যায় পড়েছে। তাদেরকে আটক করা হয়েছে, নির্বাসন দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অপার অনুগ্রহ আমি এখনো পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যায় পড়িনি। আমি একজন দায়ী বা আহ্বানকারী হিসেবে যখনই আমি দাওয়াতের সুযোগ পাব সে সুযোগটা গ্রহণ করব। আমি দাওয়াতে ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেই এবং কুরআনের নিয়ম মেনে চলি।

পবিত্র কুরআনে সূরা আলে-ইমরানের-৬৪ নং আয়াতে আছে-

অর্থাৎ, "হে নবী বলুন। হে আহলে কিতাব তোমরা আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান।"

দাড়ি টুপি মানেই কি সন্ত্রাসী ?

তাহলে আমরা যদি একই কথায় আসি, আমাদের বেশির ভাগ সমস্যাই থাকবে না। আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল আরো একমাস আগে। সে সময় লন্ডনে ছিলাম, সেজন্য বিলম্ব হয়েছে। আমি ১০ আগস্ট যখন লন্ডনের "হিথ্রো" বিমান বন্দরে পৌঁছলাম, তখনই আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ফোন আসল। আপনি এখন কোথায়? বললাম কেন? বললো, আপনি এখনো বিমান বন্দরে কেন? কি হয়েছে? বললাম কিছুই হয়নি এখানে। আসলে তখন ২১ জন মুসলমানকে বোমা মারার অভিযোগে আটক করা হয়েছিল যাদের সবারই টুপি দাড়ি ছিল। আল্লাহর দয়ায় আমি ভালভাবেই পার পেয়ে গেলাম। কারণ আমার সাথে ক্যামেরাম্যান ক্রুরা ছিল সবাই মুসলমান। আমি সেখানে বার্মিংহামে বক্তব্য দিলাম এবং ব্যাপক সাড়া পেলাম। মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বাইরে গিয়ে শুটিং করতে হত তাই পরের দিন একটা ইহুদী কবরস্থানে গিয়ে শুটিং, রেকর্ডিং করলাম। সেই ইহুদী কবরস্থানে আমরা ঘন্টা খানেক থাকলাম। তারপর আমরা ওখানকার এক গীর্জায় গিয়ে শুটিং করলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপরে বিকেলের দিকে আমরা হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম বার্মিংহামের পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত কোন পথচারী অভিযোগ করেছিল। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সাত আট জন সন্ত্রাসীকে যাদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি। তারা জানে না এই লোকগুলো কারা? আমাদের গাড়ির নম্বর তারা জানে এবং এটাও জানে যে, আমাদের গাড়ির রং সবুজ।

তারা বিভিন্ন ইনসুরেন্স কোম্পানিতে ফোন করে বের করার চেষ্টা করল আমরা কোথায় আছি? তারপর তারা এই হোটেলটা খুঁজে বের করল। তবে ভাগ্যক্রমে যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, সেখানে এক লোক নাস্তা করছিল। তার সাথে পুলিশের কথা হল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি সেই থানার প্রধানের সাথে এ কথা বললেন যে, আপনি এই সন্ত্রাসী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আপনি আসলে ভুল করছেন। আপনার খেয়াল আছে দু'মাস আগে আপনাকে একটা ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিলাম? ডা. জাকির নায়েকের ভিডিও। পুলিশ প্রধান বললেন হ্যাঁ। ইনি তো সেই লোক। সমস্যার সমাধান হল। যে পথচারী অভিযোগ করেছিল সে হয়তো ভেবেছিল দাড়ি-টুপি মানেই বিপজ্জনক। সাবধানে থাকতে হবে। আবারও আল্লাহর সাহায্য যে, নিরাপদে ফিরে এসেছি অন্যথা আমাকে এখানে দেখতে পেতেন না। আমাদের মুসলমানদের উচিত ভয় না পেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সত্য কথা বলা। পবিত্র কুরআনে সূরা "নাহল" -এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর, যুক্তি দিয়ে ও উত্তম পন্থায়।

যখন কথা বলবেন প্রজ্ঞা দিয়ে কথা বলবেন। পুরো ব্যাপারটা দেখে আমরা এখন বুঝতে পারি যে, সন্ত্রাস তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। আমি যতটুকু বুঝি সন্ত্রাস এখন রাজনীতিবিদের সম্পত্তি চাই সে আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা ভারত যে জায়গারই হোক। আগে আমাদের বুঝতে হবে এই সন্ত্রাসের পেছনে কারণটা কি? আমরা যদি সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাই, তাহলে প্রথমে এর পেছনের কারণটা বের করতে হবে। আমি একজন ডাক্তার। আমরা লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করি না; আমরা রোগের কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তারপর জীবাণুটা মারি। এটাই চিকিৎসার নিয়ম।

সন্ত্রাসবাদের গোড়ার কথা

সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা কি? বিশেষজ্ঞরা বলেন– "সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হল অন্যায়-অবিচার।" যখন একদল মানুষের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। আর এটাই হলো সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ। যে কোন দুর্ঘটনা চাই হোক সেটা নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ, ১৯৯৩ সালে বোম্বেতে সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি। এ সবের পেছনে কলকাঠি নাড়াচ্ছে রাজনীতিবীদরা। যখন লন্ডনে ছিলাম, তখন ভাবছিলাম কেন এই ২১ জন মুসলিমকে আটক করা হয়েছে। সরকার বললো তারা কয়েকমাস ধরে এদের উপর নজর রাখছিল। কিন্তু কিছু লোকের সাথে কথা হয়েছে যারা এই লোকগুলিকে ভালভাবে চিনত। তারা বলেছে অসম্ভব কখনো এমন ছিল না। তখন লোকজন অপেক্ষা করছে কখন তারা এই খবরটা জানতে পারবে। সে সময় ইসরাইল লেবাননে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে ইংল্যান্ডে এটা নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছিল। তখন মনোযোগটা ঘুরিয়ে দেয়া হল। ২১ জন মুসলিম বিমানে বোমা মারতে যাচ্ছিল, তাদেরকে আটক করা হল। অনেক বড় বড় খবর। তাই লোকজন লেবাননে হাজারো মানুষের প্রাণহানী। ভারতের কারাগিলের ঘটনা সব ভুলে গেল। এসব হচ্ছে মনোযোগ সরানো রাজনীতি। হোক সেটা আমেরিকায়, হোক ইংল্যান্ড অথবা ভারতে। আসল কারণ রাজনীতিবিদরা। আমরা জানি এদেশে প্রায় ৬০ বছর আগে বৃটিশরা আমাদের শাসন করত। তাদের প্রধান নীতি ছিল- 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' তথা, ভাগ বা পৃথক কর এবং শাসন কর। ৬০ বছর আগে আমরা বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তারা চলে গেছে কিন্তু তাদের নীতি এখনো রয়ে গেছে।

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সন্ত্রাস

আর আমাদের ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও এই বিভাজনের রাজনীতি প্রয়োগ করছেন। আর এটা করছে ভোট ব্যাংকের জন্য। সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ভারতে। আমাদের এই বিখ্যাত দেশে প্রতিদিন না হলে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। আর এর বেশিরভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হলো রাজনীতিবিদরা। ভোট ব্যাংক, ক্ষমতার লড়াই, টাকার জন্য তারাই এসব কৃত্রিম দুর্ঘটনার সূত্রপাত করে। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে, একজন দায়ী হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের অনেক মানুষের সাথে আমার কথা, আলাপচারিতা হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হিন্দু মুসলিম সবাই একসাথে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। আমাদের পারস্পরিক অমিলগুলো যাই থাক, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সাথে শত্রুতাভাবাপন্ন সম্পর্ক তৈরি করছে, যাতে করে তাদের ভোট ব্যাংকটা ঠিক থাকে। আর আপনারা দেখবেন যে প্রায় সবগুলো দাঙ্গায় তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ রয়েছে। আমরা জানি কয়েক বছর আগে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ এবং রামের জন্মভূমি নিয়ে একটা রাজনৈতিক গুজব ছিল। আমার প্রশ্ন হল হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে কতজন এই বাবরী মসজিদ আর রাম জন্মভূমির কথা জানতাম? রাজনীতিবিদরা এই গুজব ছড়ানোর আগে আমি কখনো শুনিনি।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার ভারতের বাবরী মসজিদ

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরী মসজিদে জড়ো হওয়া অনেক হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা কেউ কখনো শুনেনি। যখন রাজনীতিবিদরা এই গুজবটা দেশের মধ্যে ছড়াল, তখন মানুষও খবরটা জানল। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিল যে, বাবরী মসজিদের কাছাকাছি কোন লোক জড়ো হতে পারবে না।

রাজনীতিবিদের একটা দল রাজনৈতিক একটা গুজব প্রচার করল। ৬ ডিসেম্বর সেখানে লোকজন জড়ো হল। সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা ভালো করেই জানে তাদের পেছনে সুপ্রিম কোর্ট আছে। তারা ইচ্ছা করলে খুব সহজেই লোকজনদের সরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা ভাবলো যদি থামাই– তাহলে তো ভোট পাব না। সুতরাং লোকজন এখানে জড়ো হতে থাক। তাই হলো। তাদের কথায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। কোন প্রকার প্ররোচনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে ফেলল। এই খবরটা অনেক সরকারি TV চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছিল। বলুন তো– এই লাঠি আর ত্রিশুল দিয়ে কি মসজিদ ভাঙ্গা সম্ভব? তারা পরিকল্পিতভাবে মসজিদে বোমা ফাটিয়েছিল। সবাই বুঝতে পারবেন, এজন্য আপনাকে বোমা বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। সেখানে বোমা ফোটান হয়েছিল বলে মসজিদটা ধ্বংস হয়েছে। লাঠি আর ত্রিশুল দিয়ে তো আর মসজিদ ভাঙ্গা যায় না।

সম্ভবত জর্জ বুশ এই পদ্ধতি দেখেছিলেন। সেজন্যই তিনি নিজের দেশে এরকম অনুরূপ ঘটনা নাইন-ইলেভেন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার সময় এখন নেই যেটাকে ইনসাইড অফ নাইন-ইলেভেন বা ১১ সেপ্টেম্বরের অভ্যন্তরিক কথা। অনেক আমেরিকানের ধারণা বুশ সম্ভবত এটা দেখেই ধারণাটা পেয়েছিলেন যার প্রতিফলন নিউইয়র্কে ঘটালেন। যাই হোক এরপর ভারতে রায়ট শুরু হল পুরো দেশ জুড়েই। যেটা ছিল দেশ বিভাজনের পর সবচেয়ে বড় রায়ট। পুরো দেশ জুড়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে যাদের অধিকাংশ মুসলমান। কাকে দোষ দেবেন? ভারতের সাধারণ মানুষকে? এখানে প্ররোচিত করেছে রাজনীতিবিদরাই লড়ো, অন্য ধর্মের মানুষকে মেরে ফেল। সাধারণ মানুষ প্ররোচিত হয়ে রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। আমরা জানি, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বোম্বে। দেশ বিভাগের সময় বোম্বেতে যে রায়ট হয়েছিল সেটা ছিল বোম্বের ইতিহাসে ভয়ংকর রায়ট। সেই সময়েও এত লোক মারা যায়নি যত লোক ৯২-৯৩ সালের রায়ট-এ মারা গিয়েছিল। পুলিশ চাইলে এখানে খুব সহজেই এটাকে থামাতে পারত; কিন্তু তারা এটা থামায়নি; বরং চুপচাপ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিল। কিছু লোক ছিল ভাল যারা সামান্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ছিল নীরব দর্শক।

আমি এটা জানি যে, পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিবীদরা তাই পুলিশ ভালো কিছু করতে চাইলে রাজনীতিবিদরা বাধ্য করে। দোষটাও আবার নেতাদের উপরই পড়ে। পরবর্তীতে দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করল এবং এখানে বসাল বিচারক শ্রীকৃষ্ণকে। এই কমিশনটাকে তখন বলা হত শ্রীকৃষ্ণ কমিশন। আর আমরা জানি বিচারক শ্রীকৃষ্ণ একজন খাঁটি ধর্মভীরু হিন্দু। একই সাথে তিনি একজন সৎ ও নির্ভীক বিচারক। আমাদের অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশের মতো। তিনি যে রায় দিয়েছিলেন ভারত সরকার সেটা সহ্য করতে পারেনি। কয়েক বছর তথা দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী তিনি রায়ট পুরো কেসটাই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন, রাজনীতিবিদের সাথে কথা বললেন, পুলিশের সাথে ২৬টি থানায় গিয়ে বিভিন্ন রেকর্ড দেখলেন, থানার ছোট বড় পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে কথা বলে অনেক গবেষণার পর তিনি সেটা প্রকাশ করলেন। এই হলো সেই "ড্যামিং ভার্ডিক্টবাই শ্রীকৃষ্ণ কমিশন।" তিনি এই বইতে লিখেছেন কিভাবে আমরা এই রায়টগুলো ঠেকাতে পারি। তবে সেটা করতে সময় লাগবে। আর এ সময়ের মধ্যে সরকার বলল যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারা জানত যে, যদি তারা এ প্রতিবেদন অনুযায়ী কাজ

করে, তাহলে তারা তাদের ভোট ব্যাংকটা হারাবে। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা কমিশন বানাল। আমি ঠিক বলতে পারব না, কতগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছিল আর কতগুলো কমিশনের কথামতই বা কাজ হয়েছে। বিচারক হসবেট সুরেশ হয়তো বলতে পারবেন।

আমরা ভারতের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখব। যদিও এই দেশের মধ্যে পুলিশ, রাজনীতিবিদ ও অন্য নাগরিকরা প্রতারণা করে। তারপরও আমরা আস্থা রাখব। আমরা জানি যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশকে ছেড়ে দেয়া হবে; কিন্তু তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হল সেটা কি আর ফেরান যাবে, এর প্রতিকার কি সম্ভব? তারপর কয়েক মাস পর আমরা জানতে পারলাম ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ একের পর এক মোট ১৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল বোম্বেতে। ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেছে। ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ সেখনে আহত হয়েছে। সরকার বলল সব পরিকল্পিত। বিচারক শ্রীকৃষ্ণ বললেন- এটা পরিকল্পনা করে করা হয়নি এটা ছিল মূলত প্রতিশোধ। ১৯৯২-৯৩ সালে বোম্বের সেই রায়ট-এ মারা যাওয়া দেড় সহস্রাধিক মুসলমানদের চাপা ক্ষোভের প্রতিশোধ এটা। পুলিশ কমিশনারসহ অন্যান্য সকলেই একমত হল এটা সেই ঘটনার প্রতিশোধ।

১৯৯২-৯৩-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বোম্বের রাস্তায় মুসলমানদের হাঁটা, ট্রেনে চড়া, বাসে চড়া, অমুসলিম এলাকায় যাওয়া খুব কঠিন ছিল। তারা মাথা নিচু করে চুপচাপ চলাফেরা করত। তারপর ১২ মার্চের সেই ঘটনার পর সবকিছু বদলে গেল। বেশিরভাগ মুসলমানই জানত যে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তারপরও যারা বোমা ফাটিয়েছে তাদের উপর এদের সহানুভূতি তৈরি হল। তারা এই ভেবে খুশি হল যে, অন্যায়ের জবাব অন্যায়। এটা ঠিক নয় ইসলাম এই আক্রমণের নিন্দা করে। কারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। কারণ অন্য কেউ অন্যায় করেছে বলে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে মারতে পারবেন না যদিও অন্য ধর্মের লোক হোক। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ।

মুসলিম যারাই এ কাজ করেছে, ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষকে মেরেছে ইসলাম তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। আপনি অন্যায়ের জবাবে অন্যায় কাজ করে কখনো সুবিচার পাবেন না এবং এর কোন যৌক্তিকতাও নেই। আমরা জানি যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে ঠিক আছে। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখেছেন, যখন ২৫০-এর বেশি পরিবার জানতে পারবে যে মুসলমানরাই তাদেরকে মেরেছে, তখন তারা কি ভাববে? তারা ভাববে এটা কোন ধরনের ধর্ম। এই নিরীহ মানুষগুলোর অপরাধটা কি? কেউ যদি অপরাধ করে থাকে। আপনাকে অপমান করে থাকে, তাহলে তাকে চিহ্নিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। শাস্তি দিন কোন সমস্যা নেই। সব ধর্মই অনুমোদন করবে। পক্ষান্তরে প্রমাণ ছাড়া নিরাপরাধ মানুষকে যদি শাস্তি দেন, তাহলে সে সারা জীবন ইসলামের শত্রু হয়ে থাকবে। যদি ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেই, তাহলে কাকে দোষ দেব? আমরা জানি "নিরাময়ের চেয়ে প্রতিকার ভাল।"

রাজনীতিবিদ ও বিরোধীদলের নেতারা যদি সেই সময়টাতে বাবরী মসজিদ রামের জন্মভূমির গুজব না ছড়াত, ১৯৯৩ সালের এই বোমা বিস্ফোরণ কখনোই ঘটত না। এছাড়া রাজনীতিবিদরা খুব সহজেই এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে পারত। কারণ সুপ্রীম কোর্টের রায়, পুলিশ, মিলিটারী সবই তাদের সাথে ছিল; কিন্তু তারা ভয় পেয়েছিল যদি তারা তাদের ভোট ব্যাংক হারায়। আর এজন্য তারা মসজিদ ধ্বংসে বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ এর জন্য দায়ী সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা। তৃতীয়তঃ সাধারণ ভারতীয়রা যারা সংখ্যালঘুদের উপর চড়াও

হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এজন্য তারাও তথা সাধারণ মানুষও দায়ী। চতুর্থতঃ পুলিশ। কারণ তারা ইচ্ছা করলে এসব দুর্ঘটনা ঠেকাতে বা থামাতে পারত। এটা তাদের জন্য ছিল খুব সহজ। বিশেষ করে সেই রায়ট থামানো খুব সোজা ছিল। কিন্তু সেটাও তারা করেনি। সন্ত্রাসী আক্রমণ থামানো কঠিন ছিল সেটি আমি পরে বলছি। অল্পসংখ্যক লোক এ অবস্থার মধ্যেও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করেছিল। তবে বেশিরভাগ পুলিশই নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এরা ভয় পেয়েছিল। কারণ তারা রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে গেলে তাদেরকে বদলি করা হয়।

পঞ্চমত, যাদের দোষ দেয়া যায়, তারা হল যারা বোমাগুলো ফাটিয়েছে। ইসলাম এমন কথা বলে না যে, অন্যায় কাজ করে সুবিচার পাওয়া যায়। এই পাঁচটি দলের সবাই সমানভাবে দায়ী। যদি সন্ত্রাসী আক্রমণ বন্ধ করতে চান, তাহলে মূল কারণটা খুঁজে দেখুন। একটা বিশেষ গোত্রের উপর অন্যায়-অবিচার বন্ধ করুন, সন্ত্রাসও বন্ধ হয়ে যাবে। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ২০ মার্চ পর্যন্ত গুজরাটে একটি হত্যাকাণ্ড চলেছিল। এই ঘটনায় আগে "সবরমতি এক্সপ্রেস" ট্রেনের একটা বগি পোড়ানো হয়েছিল গোধরা-তে। এর কিছুই গোপনীয় নয় এটা সর্বজন বিদিত গোপন তথ্য। বিভিন্ন রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, বগিটার ভেতর থেকেই পোড়ান হয়েছিল এবং এটা ছিল পরিকল্পিত। মুসলমানদেরকে উস্কানী দিয়ে জড়ো করা হয়েছিল, কিন্তু তারা হত্যা করেনি, বলা হয় সেখানে ৫৯ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল যদিও এ সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ধারণা করা হয়েছিল সেখানে যারা মারা গিয়েছিল তাদের অনেককেই জীবিত পাওয়া গেছে। তারপর তাদের বক্তব্যটাও বদলাল। বলা হল- এটা ভেতর থেকেই করা হয়েছে, বাবরী মসজিদের ঘটনা, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, গোধরার ঘটনা, সবই ভেতর থেকে।

এখানে যাদের দোষ দেখা যায় তারা হলেন রাজনীতিবিদরা। তারপর এর পরের দিন থেকে শুরু হল গুজরাটের নিরীহ মানুষ তথা মুসলমানদের উপর রাষ্ট্র পরিচালিত একটি হত্যাকাণ্ড। সব কিছুই ছিল পরিকল্পিত। গুজরাটের নিরীহ জনগণকে প্ররোচিত করা হল, টাকা দেয়া হল। তারা হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করল। গুজরাট কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৯৩ জন মুসলিম এবং ২৫৩ জন হিন্দু মারা গিয়েছিল। তবে অনেক মানবাধিকার সংস্থা বলছে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম। কোন কোন রিপোর্টে বলছে পাঁচ হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম মারা গিয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হাজারো মুসলমানকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে লুটপাট করে তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার দোকান-পাট, জীবিকার স্থান পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গায় যতো লোক মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক কম মানুষ মারা গেছে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়। তারপরও জর্জ বুশের মতে গুজরাটের হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী না।

তবে যদি আমেরিকানদের ক্ষতি হয়, তাহলে সেটা একটা সমস্যা। আমরা জানি গুজরাটে হাজারটা প্রমাণ আছে। প্রমাণ দেখতে চান খবরের কাগজে, বুকলেটে যার নাম 'কমিউনালিজম কমব্যাট' এছাড়া, ভিডিও, ভিসিডি, ডিভিডি-তে গুজরাটের হত্যাকাণ্ড আর হত্যাকারীদের সব প্রমাণ। সব প্রমাণ আছে; কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। এমনকি দুঃখের বিষয় আমাদের বিচার ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে। আমার মতে তাদের উপরও রাজনীতিবিদদের চাপ ছিল। আর তখন এই কারণেই ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট গুজরাটের হাইকোর্টের বিরুদ্ধে একটা

মন্তব্য করেছিল, যে তারা পক্ষপাত দুষ্ট ছিল এবং এটা প্রমাণিতও হয়েছিল। এসবই ছিল রাজনীতিবিদদের চাপে। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। আর চিন্তা করে দেখলাম এর কয়েক মাস পরেই আক্‌শার ধাম মন্দির হত্যাকাণ্ড। দুজন লোককে ধরে মেরে ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমান। অভিযোগ করা হল– এই দুজন শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মন্দিরের মধ্যে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। ইসলাম এটার সমর্থন করে না। তাদের হয়তো যুক্তি আছে যে, তাদের চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষকে মারা হয়েছে, আমাদের চোখের সামনে মা-বোনদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। আমরা জানি, যারা দায়ী তারা আমাদের প্রতিবেশি, আমাদের আশেপাশেই থাকে, সবসময় দেখা হয়। কিন্তু যখন তাদের দেখি তখন অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। এসকল ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যখন আইনের কাছে যায়, আইন কোন সাহায্য করে না তাই তারা আইনটা হাতে তুলে নেয়।

আমি তাদের কাজকে সমর্থন করছি না। ইসলাম আপনাকে আইন হাতে তুলে নিতে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে অনুমোদন বা সমর্থন দেয় না। শুধু তারাই সমর্থন করে, যারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা বলে– আমাদের মা-বোন ধর্ষিত হয়েছে, অপরাধী আমাদের সামনে আছে। কেউ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আইনটা হাতে তুলে নিয়েছি। যদি অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারেন। প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তাকে শাস্তি দেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন না। ইসলাম কোনভাবে এটা সমর্থন করে না। কারণ অন্যায় কাজ করে আপনি কখনো ভাল কিছু পেতে পারেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলামে এটা অন্যায় অনৈতিক। নিরীহ মানুষ হত্যা করার কথা চিন্তাও করা যায় না। শ'খানেক মানুষ মারা গেল দু'জন লোকের প্রতিশোধের কারণে। এদের আপনজনেরা এখন ইসলামের শত্রু হয়ে যাবে।

এরপর ২০০৬ সালের ১১ জুলাই বোম্বেতে ট্রেনের ভেতরে একের পর এক ৭টি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে। এখানে ২০০ জনের বেশি নিহত হয় এবং ৮০০ জনের বেশি আহত হয়। এখানে পুলিশ আর কর্তৃপক্ষ বলল এই ঘটনাও গুজরাটের সেই রায়ট হাজার হাজার মুসলমান হত্যার বদলা নিতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তখন বলল এই ঘটনার জন্য দায়ী হলো এল. ই. টি. লস্কর-এ তৈয়েবা। যদি একের পর এক ঘটনাগুলো দেখেন, একই ধারায় এগুলো ঘটছে। এটা কি বন্ধ করা যেত না? এটা খুব সহজ ছিল। এজন্য দায়ী কে? এক নম্বরে সেই রাজনীতিবীদরা যাদের পরিকল্পনায় 'গোধরা'-তে 'সবরমতি এক্সপ্রেস' ট্রেনের সেই বগিটা পোড়ান হয়েছিল। এ জন্য তারাই দায়ী। দুই নম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই লোকগুলো যারা ইচ্ছা করলে এটা থামাতে পারত; কিন্তু তারাও এক দলের পক্ষে সে জন্য তারা কিছুই করেনি। তিন নম্বরে গুজরাটের সাধারণ জনগণ যাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানো হয়েছিল এবং তারা এ পদে পা দিয়েছিল এজন্য তারাও দায়ী।

চার নম্বরে আমরা রেকর্ড থেকে জানতে পারি বেশিরভাগ জায়গায় হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে খোদ পুলিশের তত্ত্বাবধানেই। তদন্ত কমিশন বলছে এজন্য তারাও দায়ী। পাঁচ নম্বরে গুজরাটের বিচার বিভাগ, কারণ তারা কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ছয় নম্বরে যে লোকগুলো বোমা মেরে অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, ইসলাম এটা সমর্থন করে না তাই তারাও সমভাবে দায়ী। এই ছয় প্রকারের লোকজনই দায়ী। তবে যদি আমরা প্রথম দিনের অন্যায়গুলো ঠেকাতে পারতাম তাহলে এই সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হত না। আমরা জানি গত এক মাসে অনেক মুসলমানকেই হয়রানি করা হয়েছে যেটা করেছে পুলিশ। এখানে পুলিশ বলছে এ ঘটনা মুসলমানরাই ঘটিয়েছে।

এর পেছনে রয়েছে এল. ই. টি লস্কর-এ-তৈয়েবা। আমি বলি এ কথাটা যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাদের ধরে শাস্তি দেন, সমস্যা নেই। কিন্তু আপনারা নিরীহ মুসলমানদেরকে হয়রানী করতে পারেন না। কয়েকশ মানুষকে জড়ো করে আটক করা হয়েছে। তাদের আপনজনেরা কিছুই জানেনা। চিন্তা করুন সেই হাজার হাজার আত্মীয়-স্বজনকে হয়রানী করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ২২৫ জনকে অফিসিয়ালভাবে আটক করা হয়েছে যাদের একজনও সরাসরিভাবে এই বোমা বিস্ফোরণে জড়িত নয়। এদের সবাই অন্য কোন ঘটনার সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। যদি আপনি অপরাধিদেরকে ধরতে চান, যদি প্রমাণ থাকে তাহলে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু ঢালাওভাবে মুসলমানদের আটক করে আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? আমি জানি যে, ৩০০-এর বেশি নিরীহ মুসলমানকে 'মালওয়ানিতে' জড়ো করা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বুদ্ধিমান যে কোন লোকই বলতে পারে যে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জনপ্রতি ৩/৪ জন পুলিশ লাগেই। একজন নোট করবে, একজন ভয় দেখাবে, একজন সবকিছু দেখবে। ঠিকমত জেরা করার জন্য এক থেকে দু'ঘন্টা সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বলবেন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা তাই আমি বললাম কমপক্ষে দু'ঘন্টা তো লাগবে। তারা কতজনকে জেরা করতে পারবে? মালওয়ানি থানায় ততজন পুলিশ আছে বা থাকতে পারে? আর একজন কতজনকে জেরা করবে? দশটা, বিশটা, তিরিশটা সেখানে বেশি হলে ১০০ জন পুলিশ হবে এবং তারা ৩০০ জনের বেশি লোক জড়ো করল। সারাদিন তাদেরকে দাড় করিয়ে রাখল। তাদের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছেড়ে দিল। পুলিশদের প্রতি আমার অনুরোধ মুসলমানদের উপর কিছুটা বিশ্বাস রাখুন। সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণটার পরে অমুসলিম কিছু লোক এই অনুষ্ঠানটা করেছিল। মুসলমানরাও সেখানে ছিল সন্ত্রাস বিষয়ে এ অনুষ্ঠানে তারা বোম্বে থেকে দু'জন প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ করেছিল।

একজন মঞ্চে আসলেন এবং সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য দোষারোপ করলেন পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোকে। দ্বিতীয়জন দোষারোপ করলেন ভারতের মাদ্রাসাগুলোকে। তারা বললেন, মাদ্রাসাগুলোতে থাকা উচিত কম্পিউটার, ইংরেজি। আমিও একমত কিন্তু যদি বলেন, যে ভারতের মাদ্রাসাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত আছে তাহলে এটা মিথ্যা বললেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শ্রোতাদের মধ্যে একজন আইনজীবী ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি পুলিশ কর্মকর্তাকে বললেন যে, আপনি আমাকে একটা প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, ভারতের কোন একটা মাদ্রাসা কোন রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত আছে? তিনি বললেন, আমি জানি না, চিন্তা করুন একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা না জেনেই কেমন একটা মন্তব্য করে ফেললেন। এর মাধ্যমে কি বুঝান হচ্ছে? হিন্দুরা তো এতে করে মাদ্রাসার বিপক্ষে যাবে। এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য যদি একজন পুলিশ অফিসার করেন সেটা কি তার জন্য শোভনীয়? কিন্তু আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে উক্ত পুলিশ অফিসারের নাম উল্লেখ করিনি।

আমি এমন কোন মাদ্রাসার কথা জানিনা যেটা কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি হয়তো আপনি মানেন না। সেখানে নতুন পদ্ধতি তথা ইংরেজি, কম্পিউটার এগুলোর শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলে তো আপনি তাদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়াতে পারেন না। মাদ্রাসার লোকদের সাথে আমি কথা বলেছি যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মাদ্রাসার উন্নতি প্রয়োজন। তারাও একমত। কিন্তু মাদ্রাসাগুলোকে

সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত করা তো স্পষ্ট মিথ্যা। আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি? এসবের মাধ্যমে আপনারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন। আমরা জানি কয়েকশ মুসলমানকে আটক করা হয়। আটকের পর পুলিশ বাসায় বাসায় তল্লাসী চালিয়ে তারা জিহাদের উপর কিছু বই পেল। প্রমাণ! প্রমাণ! এই বইগুলোই প্রমাণ যে, তারা সন্ত্রাসী আক্রমণে জড়িত। বোম্বেতে মিডিয়া বলেছিল, মোহাম্মদী রোডের বুকস্টলগুলোতে এই একই বই কয়েক বছর ধরেই পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটাই কি অপরাধ? আর এটাই যদি অপরাধ হয় তাহলে বুক স্টলগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না কেন?

আমি এখানে বলতে চাই আপনারা কি জানেন যে কুরআনেও জিহাদের কথা বলা হয়েছে। আর প্রায় সব মুসলমানের বাড়িতে কুরআন শরীফ আছে। তাহলে কি আপনারা বোম্বের সব মুসলমানকে আটক করবেন? আপনারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন? আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে চাই- আপনারা যদি মহাভারত পড়েন, তাহলে মহাভারতে কুরআনের চেয়ে অনেক বেশি খুনোখুনির রক্তপাতের কথা বলা হয়েছে, আপনি যদি তুলনা করেন মহাভারতে যে পরিমাণ রক্তপাতের কথা বলা আছে, সে তুলনায় কুরআনে রক্তপাতের বিষয় অনেক কম।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা আসলে হলো অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ। অর্জুন বলছে কিভাবে আমার জাতি ভাইদের সাথে যুদ্ধ করব। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বলতে লাগল আমি আমার ভাইদের না মেরে নিরস্ত্র অবস্থায় এখানেই মারা যাব এখনই। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলল, অর্জুন তুমি এতটা পুরুষত্বহীন হলে কিভাবে? এটা আপনি পাবেন "ভগবদগীতা"র প্রথম অধ্যায়ের ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে।

কৃষ্ণ আরো বলল ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। আমরা যদি ভগবদগীতা ও মহাভারতে উল্লিখিত যুদ্ধের পেছনের কারণগুলো দেখি, সবগুলো যুদ্ধেরই কারণ ছিল সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। সবগুলো ছিল ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের, সত্যের সাথে অসত্যের যুদ্ধ। ভগবদগীতা আর মহাভারত বলছে যদি তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়, যুদ্ধ কর মিথ্যার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে হোক সে তোমার ভাই, হোক তোমার আপনজন। একই কথা কুরআনও বলছে। এখানে আমি একটা কথা বলব যে, পুলিশ সদস্যদের উচিত হবে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের রীতি নীতিগুলো ভালভাবে জানা। আমি নিজে যখনই সুযোগ পাই জানার চেষ্টা করি। গত কয়েক বছর আমি অনেক পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি, এমনকি কয়েক বছর আগে হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে একশতের বেশি আইপিএস, ডিআইজি, ডিজি, ন্যাশনাল একাডেমীর পরিচালকসহ বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার কথা শুনে হতবাক হলেন। তাই বিভিন্ন ধর্মের রীতি-নীতি সম্পর্কে আমাদের সবারই কিছু জানা উচিত।

আমি যদি এখানে এখন মহাভারত আর ভগবদগীতার শ্লোকগুলো পেছনের তথা প্রেক্ষাপট উল্লেখ ছাড়াই বলি তাহলে এখানেই একটা রায়ট বেঁধে যাবে। তাই সকলের নিজের ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মগুলোও বুঝতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাহরাইন, সৌদি আরব, আরব-আমিরাত বিভিন্ন দেশের মিলিটারী ও পুলিশের সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। বিশেষ করে অমুসলিম পুলিশদের সাথে কথা বলতে ভাল লাগে। ইসলামের সাথে তাদের পরিচয় করাতে পারি। কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে

চেনে। তাই আমি বলব আমাদের একে অন্যকে বুঝতে হবে। আমাকে এর আগেও অনেক আইনজীবি বলেছেন যেটা বিচারক সুরেশ বললেন যে তাদের উপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের অনেককে সাদা কাগজে এমন বিষয়ে সই করতে হয়েছে যে কথা জানে না।

আপনারা যদি জানেন কে অপরাধী এবং যদি এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তদেরকে আলাদা করে অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তি দিন। আমরা এটার বিপক্ষে না। তবে যদি আপনি দশজন সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আটক করেন, তাহলে আপনি ঐ দশজন সন্ত্রাসীকে ধরতে পারেন বা না পারেন এটা নিশ্চিত আপনি আরো অনেককে সন্ত্রাসী বানালেন। একজন পুলিশ কর্মকর্তা একদিন বললেন, জাকির ভাই, আমি খুব খুশি হব যদি আপনি হিন্দি ও উর্দুতে বক্তব্য রাখেন, তাহলে ভারতের সবাই শুনবে এবং বুঝতে পারবে। তখন আমি বলিনি এই কয়েক বছর হলো আমি বলা শুরু করেছি। সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের অনেকেই এটা বলেছে। আর তারা জানে যে, আল্লাহর অসীম দয়ায় আমার বক্তব্য শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ আসে।

আমি যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলাম অফিসিয়াল অতিথি হিসেবে মন্ত্রীদের সাথে আমার দেখা করতে হয়েছে। এমনকি তৎকালীন কাশ্মীর গভর্নর সাকসেনা আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন এবং দাওয়াতও দিলেন। আমার একেবারেই সময় নেই, তারপরেও সময় বের করতে হবে। দুপুরের দাওয়াত ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সকালে গেলাম। এই গভর্নর আর্মিতে ছিলেন। সম্ভবত কর্ণেল মেজর বা এ জাতীয় কোন পদে হবেন। আমরা দু'জনে কাশ্মীরের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম, কয়েক বছর পর তিনি মহারাষ্ট্র রাজধানী মুম্বাইতে আসলেন। এবারও দেখা করতে চাইলেন। আমাকে গভর্নরের বাসভবন 'রাজভবন' এ ডেকে পাঠালেন। আমিও দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, ডা. জাকির, কাশ্মীরে আপনার বক্তব্যের যে প্রভাব, মানুষ যেভাবে আপনাকে মানে, আমরা চাই আপনি আবার আসেন আমাদের রেডিও টিভিতে অনুষ্ঠান করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম আমার বক্তব্যে কি কাজ হবে? আমি জানি না কুরআন হাদীসে কোথাও এমন কোন কথা আছে কিনা, যেখানে নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার সমর্থন দেয়া হয়েছে। আপনি কোন নিরীহ মানুষকে মারতে পারেন না এমনকি যারা আপনাদের উপর বিভিন্ন প্রকার অবিচার করে সেই ধর্মের লোক হলেও। কিন্তু অনেক নিরীহ মুসলমানকে হয়রানির শিকার করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে এসব কিছুর পেছনে আছে লস্কর-এ তৈয়বা। পুলিশ কখনো কখনো বলছে যে স্থানীয় লোকজনও এটার জন্য দায়ী। জড়িত তা না হলে বোমা বিস্ফোরণগুলো হতোই না। চিন্তা করুন সবাই যদি লস্কর-এ-তৈয়বার সাথে জড়িত থাকে এবং হাজার হাজার মানুষকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন, অত্যাচার করেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন রিক্রুট পাবেন। পুলিশ লস্কর-এ-তৈয়বাকে সাহায্য করেছে। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি চাইনা পুলিশ আমাকে ভুল বুঝুক। না হলে কালকেই আমাকে আটক করতে আসবে।

ধরুন, আমি মেনে নিলাম যে, আপনার অনুমানটাই ঠিক। লস্কর-এ-তৈয়বার সাথে জড়িত আর স্থানীয় লোকজনও জড়িত। আপনাদের উচিত হবে মুসলমানদের কিছুটা হলেও বিশ্বাস করা; কিন্তু এভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে এক জায়গায় জড়ো করার অর্থ কি? আমরা জানি অপরাধীদের ধরা খুব কঠিন। বিশেষ করে এই বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে নিখুঁত নির্ভুলভাবে। পুলিশী ভাষ্য অনুযায়ী এর পেছনে দক্ষ লোক ছিল। আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি যে, অপরাধী চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে,

জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনারা কিছু নিরীহ লোককে বেছে নিলেন। এই পদ্ধতিটা কি যৌক্তিক? এ পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় বক্তব্যে কাজ হবে? খুব বেশি হলে আমার কথাগুলো শুনবে ২-৩ পার্সেন্ট লোক। সর্বোচ্চ ৫% তার বেশি নয়।

আমাদেরকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখানে মূল কারণটা কি? আর পুলিশের উচিত হবে মানুষের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করা। যদি বিশ্বাসটা না থাকে, তাহলে কিভাবে তারা সন্ত্রাস ঠেকাবে। যদি আপনারা শ্রদ্ধা পেতে চান, অন্যকে সম্মান করুন। তবে অনেক পুলিশ কর্মকর্তাও আছেন, যারা মানুষ বিপদে পড়লে সাহায্য করছে। কিন্তু তাদের সাধারণ প্রকৃতি হলো ওহ আপনার দাড়ি আছে! আপনি প্যান্ট পরেছেন গোড়ালীর উপরে, আপনার মাথায় টুপি, এভাবে বিব্রত করা, এরকম কোন নিয়ম আছে কি যে, সন্ত্রাসীদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি থাকবে, প্যান্ট পরবে গোড়ালীর উপর, আর এগুলো থাকলেই সে সন্ত্রাসী। তাহলে আমি তো এক নম্বর সন্ত্রাসী। এসবের মাধ্যমে আসলে আপনারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন? ইসলাম ধর্মটাকে আপনাদের ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। একই কথা বলেছেন উইলিয়াম ড্যাল্‌রিম্‌পল আমেরিকার সরকারকে যে আপনারা ইসলামকে বুঝেন না, জর্জ বুশ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটি কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তিনি যদি কিছুই না জানেন, না বুঝেন তাহলে কিভাবে এটার সমাধান করবেন।

আর জুলিও রোবোরো-এর কথা অনুযায়ী যেটা ৯ সেপ্টেম্বরের হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তিনি সেখানে বলেছিলেন, যত বেশি নিরপরাধ লোককে আটক করা হচ্ছে, সফল হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই কমে যাচ্ছে। যত বেশি নিরীহ লোককে আটক করবেন, আসল অপরাধীদের ধরতে পারার সম্ভাবনা ততটাই কমে যাবে। ২০০৬ সালের ২য় সেপ্টেম্বর বোম্বের পুলিশ কমিশনার এ. এন. রায় একটা ভাল কাজ করেছিলেন। তিনি প্রায় শ'খানেক মুসলিম নেতাদের একটা চিঠি দিয়েছিলেন এ বলে যে, তদন্ত নিরপেক্ষভাবেই হচ্ছে, তিনি তার চিঠিতে আরো বলেছিলেন– আমাদের যদি কোন কিছু জানার থাকে, তাহলে যেন আমরা তার সাথে বলি। সত্যিকারার্থে এটা ভালো পদক্ষেপ। তাই আমি আশা করি এই চিঠিগুলো যেন শুধুমাত্র লোক দেখানো কথাই না হয়। নিরীহ মুসলিমদের যেন আসলেই হয়রানির শিকার হতে না হয়। আপনারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতে চান, তাহলে চেষ্টা করুন। যাতে মুসলমানদের বিশ্বাসটা অর্জন করা যায়। আর তখনই একমাত্র আসল অপরাধীদের ধরতে পারবেন। আর আসল অপরাধীদের ধরতে পারেন তারা যে-ই হোক অবশ্যই তাদের শাস্তি দেয়া উচিত।

আমরা জানি যে, বেশির ভাগ মুসলমানকে ধরা হচ্ছে। তারা যুক্তি দিয়েছিলো যে, পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের ঘটনায় আটককৃতদের বেশির ভাগ হলো শিখ, আসামে বেশির ভাগ হিন্দু, তামিলনাড়ুতে বেশির ভাগ এল, টি,টি,ই তারাও হিন্দু একইভাবে মুম্বাইতে মুসলমান। কারণ অনেকে মনে করেন যে, এখানে পাকিস্তান আর কাশ্মীর আছে তাই তাদের অধিকাংশ হবে মুসলিম। আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যদি পাঞ্জাবে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়, তাহলে পাঞ্জাবের বেশির ভাগ মানুষ শিখ তাই, শিখদের এখানে আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে সংখ্যাধিক্য বিচারে আসামে তামিলনাড়ুতে হিন্দুদের আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বোম্বেতে বেশির ভাগ মানুষ কি মুসলমান? মুসলমানরাই এখানে সংখ্যালঘু। তাহলে কেন তাদেরকেই আটক করা হচ্ছে? যদি আপনাদের মনে হয় যে, কাজটা করেছে কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা, যদি প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে আপনি কি ভাবেন এল,টি,টি,ই বোম্বেতে আসতে পারে না? আপনারা বলতে পারেন না যে, এই কাজটা অবশ্যই

মুসলমানদের। আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো আপনারা প্রমাণ ভিত্তিক বিচার করুন। অনর্থক নিরীহ মানুষদেরকে আর হয়রানি করবেন না।

কয়েক মাস আগে মহারাষ্ট্রের এ. টি. এস এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬ জনের একটি হিন্দু উগ্রবাদী দলকে আটক করা হয়েছে। যারা তিনটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত। এর একটি ছিল পার্বনীর মসজিদ এবং অপর দুটি ছিল যথাক্রমে 'জালনা' ও 'পুনা' মসজিদ। আর কিছুদিন আগে ৬ এপ্রিল এক জায়গায় ভুলক্রমে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ভুলের কারণে তৈরির সময় বোমাটি ফেটে যায়। নিহত হয় ৪ জন এবং আহত হয় ১১ জন। তদন্ত করে দেখা গেল তাদের অনেকেই সেই উগ্রবাদী হিন্দু দলের সদস্য। পুলিশ জানতে পারল যে, তারা পরিকল্পিতভাবে শিখদের ছদ্মবেশে মসজিদে আক্রমণ করবে।

আর তখন মুসলমান ও শিখদের মধ্যে একটা গোলমাল চলছিল। একটা শিখ মেয়ে আর একটি মুসলিম ছেলে বিয়ে করা নিয়ে উত্তেজনা। তারা শিখদের ছদ্মবেশে যেখানে হিন্দুরা মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি নিয়ে, তাই বলতে পারেন এখানে মুসলমানরাই জড়িত, হতে পারে, আমি একেবারে না করছি না। এইতো মাত্র কয়েকদিন আগে শুক্রবারে ৮ সেপ্টেম্বর ৪টা বোমা ফুটেছিল 'মালেগাও'তে। একটা মসজিদের সামনে আর একটা কবরস্থানে, এখানে ৩৫ জন মুসলমান মারা গেছে, আহত হয়েছে ১০০ জনেরও বেশি মুসলমান। আবারও প্রধান সন্দেহভাজন এল.টি.টি.ই হতে পারে তবে প্রধান নয়। চিন্তা করুন আসলে এটা একটা খেলা তথা নামের খেলা। যদি আমেরিকায় যান সেখানে আল কায়দা আর এখানে এল.টি.টি.ই।

৬ সেপ্টেম্বর ডি. এন. এ পত্রিকায় একটি খবর এসেছিল, জোসেফ নামক জনৈক ভদ্রলোক বলেছেন, যে পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা বলেন, খুব বেশি কাদা ছোড়াছুড়ি করলে সমস্যার সমাধান হয় না। আসল অপরাধীও কখনো ধরা পড়ে না। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের শাস্তি হওয়াই উচিত। আমি এখানে একেবারেই কোন সন্ত্রাসী কাজকে সমর্থন করছি না, হবে আপনাদের সর্বাগ্রে যে জিনিসটা করা উচিত, তা হলো নিখুঁত তদন্ত। এসবের আরেকটা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো রাজনীতিবিদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। এদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে। মিডিয়া সব সময় সাদাকে কালো, দিনকে রাত, নায়ককে ভিলেন আর ভিলেনকে নায়ক বানায়। আমার ভিডিও ক্যাসেটে এগুলোর অনেক উদাহরণ দিয়েছি। তবে ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, এখানের জনপ্রিয় মিডিয়াগুলো রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে আমরা দেখি মিডিয়া সত্য খবরটাই আমাদের জানাচ্ছে। হতে পারে সেটা গুজরাটের রায়ট, ৯৩ সালে বোম্বের রায়ট অথবা আজকের নিরীহ মুসলিমদের হয়রানি।

এখন সব ধরনের মিডিয়া তথা সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি আমাদেরকে কোথায় কি ঘটছে তার সত্য খবরটাই জানিয়ে আসছে। আবার মাঝে মধ্যে এমন খবর প্রকাশ করে যা খুবই চাঞ্চল্যকর। তবে সামগ্রিকভাবে আমাদের মানতে হবে যে, আমাদের মিডিয়া এখনো সৎ। আমি অমুসলিম মিডিয়ার কথা বলছি, মুসলিম মিডিয়া নয়। আমি যদি ভারতের বিচার বিভাগ সম্পর্কে বলি, ভারতের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলিম ক্ষতিগ্রস্তরা ভারতের বিচার বিভাগের উপর আস্থা হারিয়েছে। সেখানে কিছু লোক আছে যারা বিচার বিভাগের কলঙ্ক। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা জানি বেশিরভাগ বিচারক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ। শুধু আশা করব যেন এই মানুষগুলো রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ না করে। আমার জানা মতে বেশির ভাগ বিচারকরাই রাজনীতিবিদদের কথায় তেমন একটা প্রভাবিত হন না। এই রাজনীতিবিদরা যদি ভারতের বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে, তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তবে এখনো আমরা বিচার বিভাগের উপর আস্থা রাখি।

সন্ত্রাসের মূল কারণ হল অবিচার

সবশেষে আমাদের বুঝতে হবে আমরা যেহেতু জানি যে সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হলো অবিচার, তথা একটা বিশেষ গোত্রের মানুষের উপর অত্যাচার। এটা বন্ধ করতে হবে। কিভাবে বন্ধ করব? আমি আগেও বলেছি, এক নম্বর রাজনীতিবিদের সৎ ও ন্যায়বান হতে হবে। ভোট ব্যাংক নিয়ে তাদের দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক হবে না। তারা যদি সৎ ও ন্যায়বান হয়, হতে পারে তারা কোন আসন পেল না; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। দুই নম্বর পয়েন্ট ভারতের জনগণ। তাদের উচিত হবে না রাজনীতিবিদদের উষ্কানীতে মেতে উঠা এবং মানুষ হত্যা করা। তিন নম্বর পয়েন্ট, পুলিশের ন্যায়বান হতে হবে। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশকে তাকে রক্ষার কাজে এগিয়ে যেতে হবে এবং কখনো রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে না।

আমি জানি এরূপ করলে তাদের হয়তো বদলি করা হবে। কিন্তু সবাই যদি সৎ হয়ে যায় তাহলে নতুন যে পুলিশ অফিসার আসবে সে-ও সৎ হবে। আর যখনই সবাই সৎ ও ন্যায়বান হয়ে যাবে তখন রাজনীতিবিদরা কি করবে? আমি জানি অধিকাংশ পুলিশ কর্মকর্তা সৎ কিন্তু বিভিন্ন মহলের চাপে বদলির আশংকা বিভিন্নভাবে তারা হয়রানির শিকার হয়, তারা সবাই যদি একক সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা সবাই সৎ থাকব। আমরা বদলির ভয় করব না ইত্যাদি। তাহলে বেশির ভাগ সমস্যা অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে। তারা অন্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারে না, যদিও নিরীহ মানুষগুলো সেই অত্যাচারী দল বা গোষ্ঠির সমগোত্রীয়।

এগুলো মেনে চললে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে এবং এটা আশা করা যায় যে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ভারত সুপার পাওয়ার হবে যদি ভারতের হিন্দু-মুসলিম আমরা এক সাথে পাশাপাশি থেকে ভালবাসা, আন্তরিকতা ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী হয়ে যার যার ব্যক্তিসাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করতে পারি। আমাদের ভিতরে পার্থক্য থাকতে পারে, থাকবে এবং এ পার্থক্য নিয়েই আমরা থাকব, একবার মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন– "যদি ভারতকে উন্নত করতে হয়, তাহলে ভারতের দরকার একজন শাসক। যিনি হযরত ওমর (রা)-এর মত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।" তিনি একজন সৎ ন্যায়বান মানুষ ছিলেন। কেউ সুবিচারের জন্য আসলে তিনি এটা দেখতেন না যে মুসলিম না অমুসলিম; বরং সুবিচার করে দিতেন। এজন্য তাকে বলা হত আল-ফারুক (যে সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করে) আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেছিলাম– সূরা বনি ইস্রাঈলের ৮১ আয়াত

"(হে নবী) আপনি বলুন, সত্য আগত মিথ্যা পরাভূত। মিথ্যার পরাজয় নিশ্চিত)"

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে ডা. এ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি– "যারা ভয় পায় যে, একদিন পারমানবিক বোমা আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটা বুঝতে পারে না যে, ইসলামিক বোমা অনেক আগেই পৃথিবীতে পড়েছে। এটা পড়েছে সেদিন যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক : এতক্ষণ বক্তৃতা শোনার জন্য, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশাকরি আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকেও আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। প্রথমেই অনুরোধ করব মহিলাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রশ্ন করার জন্য।

প্রশ্ন : আমার নাম প্রীতি শেঠী। আমার প্রশ্ন হলো আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, ওসামা বিন লাদেনকে আমরা সন্ত্রাসী বলতে পারি না যেভাবে বিবিসি আর সিএনএন খবর প্রচার করছে। কিন্তু এর পাশাপাশি এই চ্যানেলগুলো থেকেই আমরা এসব বিস্ফোরণের বিভিন্ন খবর, হতাহতের সংখ্যা জানতে পারছি। একই চ্যানেল থেকে, এই খবরটা কি আমরা বিশ্বাস করব, নাকি করব না?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি খুব সুন্দর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। আমি বলছি বিবিসি যে ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী বলছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেই বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা যেটা বলছে সেটা বিশ্বাস করব কিনা? এজন্যই বলেছিলাম মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে, বিবিসির সব খবরই মিথ্যা বা ভুল। যেই খবরটাতে তারা একজন হিরোকে ভিলেন বানাচ্ছে সেখানে তাদের লাভটা কি, সেটা একটু ভাবতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি দেখবেন যেটা সরকারি চ্যানেলে হয়ে থাকে সেটা হলো– সেই দেশেই যদি বিস্ফোরণটা হয়ে থাকে, তাহলে নিহতের সংখ্যা সাধারণত কম বলা হয়। কারণ তারা দেখাতে চায় কম মানুষ মারা গেছে। যেন পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন, ১৮৭ জন মারা গেছে। আর খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ১৯৭ জন। আমি জানিনা আসলে কে ঠিক, বা আমি বলছি না কমিশনার এ, এন রায় মিথ্যা বলছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, তবে যখন আমরা একটা খবর পাই প্রথমেই তার প্রমাণ দেখব। ওসামা বিন লাদেনের এ খবরটা যখন দেখি এমনকি বিবিসিতেও বলা হচ্ছে প্রধান সন্দেহভাজন। আপনি যদি আমেরিকার বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে যান দেখতে পাবেন, তারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর একটা তালিকা দিয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন ৪৩টি। ৬০% হলো মুসলিম দল, বলতে পারেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠন কোনটি? কোনটা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন? কোন মুসলিম সংগঠন সবচেয়ে জনপ্রিয়। আল-কায়দা। এই উত্তরের জন্য কোন পুরস্কার পাবেন না। কারণ খুব সোজা উত্তর আল-কায়দা। আমেরিকার বিচার বিভাগের মতে এই আক্রমণের মধ্যে উলফা ৭৪৯টা, আল কায়দা ২৮টার মধ্যে ২৬টা আক্রমণের অভিযুক্ত আর বাকী ২টা আল-কায়দা দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন সেখানে একটি আক্রমণ ও আল-কায়দা বলে প্রমাণিত হয়নি। আমি এখানে আল-কায়দাকে সমর্থন করছিনা। আপনারা জানেন 'ইয়োহাম রেডলী' যখন আফগানিস্তানে গেলেন, তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিনি ফিরে আসলে তাকে প্রশ্ন করা হলো' "আল কায়দা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, আমার সন্দেহ আছে আল-কায়দা আসলেই আছে কিনা? তাই বোন, আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি মিডিয়ার লোক হয়ে থাকেন অথবা মিডিয়ার কাজ করেন, তাহলে খবরটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটি ঠিক? আর কোনটি যাচাই-বাছাই করতে হবে? বিবিসি, সিএনএন যদিও বলছে প্রধান সন্দেহভাজন। কিন্তু এমন ব্যবহার করছে যেন তারাই অপরাধী। আপনি কি আফগানিস্তানের হাজার হাজার নিরীহ

মানুষকে মেরে ফেলবেন সন্দেহের দায়ে? আমরা যখন খবর শুনি তখন আমাদের বুঝতে হবে কে খবরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে? এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কি? তাহলেই আমরা সঠিক খবরের সত্যতা যাচাই করতে শিখব।

প্রশ্ন : আমার নাম শামসুন্নাহার। আমি মারাঠি। মহানগর পেপারে কাজ করি। আপনার বক্তব্য শুনে প্রশংসার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয় ভারতে হিন্দু আর মুসলিম এক হওয়ার জন্য কিছু একটা করা দরকার। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে, ভারতের বিভিন্ন বস্তিতে যারা থাকে তারা গ্রাম থেকে বোম্বে এসেছে রুটি-রুজির জন্য। এই বস্তিগুলোতে যে হিন্দু-মুসলিম আছে তারা একে অন্যকে অপছন্দ করে। আর এর পারস্পরিক অন্তঃদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আপনি কি বলেন? হিন্দু-মুসলিম কিভাবে এক সাথে থাকতে পারবে?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে আমি বলব আমার একটা ভিডিও বক্তব্য আছে হিন্দু-মুসলিমদের সাদৃশ্যগুলো নিয়ে। আমি বোম্বে, চেন্নাই এবং ভারতের আরো বিভিন্ন জায়গায় আমি বক্তব্য দিয়েছি, যেখানে হাজার হাজার মুসলিম অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুও এসেছিলেন। তাদের অনেকেই আমাকে বলেছিল জাকির ভাই আমাকে এই হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি সেগুলো এই চার ঘণ্টায় জানতে পারলাম। আমি এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মেনে চলি। যেটা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আছে–

"হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা একটি কথা বা বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান আর তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না।'

আমাদের বুঝতে হবে তবে আমার এটা কখনোই মনে হয় না যে, হিন্দু-মুসলিম একই জিনিস। ইসলাম ধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্মও এক। এটা ঠিক নয়, হিন্দু কোন পণ্ডিতকে মুসলমান হতে বললে, কোন মুসলমানকে খ্রিস্টান হতে বললে বা কোন খ্রিস্টান যাজককে হিন্দু হতে বললে কেউই রাজি হবেন না সকলেই না বলবেন, তাহলে এক জিনিস কোথায়? এগুলো মোটেও এক নয়, আমাদের কিছু পার্থক্য ও কিছু সাদৃশ্য আছে। আসুন আমরা সবাই আমাদের সাদৃশ্যগুলো মেনে নেই। আমাদের মাঝে পার্থক্য না হয় কিছু থাকল। আমি যেটা বলি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে হতে পারে সেটা, ভগবদগীতা, হতে পারে বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কুরআন, আসুন সাদৃশ্যগুলো দেখি। পার্থক্য নিয়ে পরে এক সময় আলোচনা করব, তবে যে কথাগুলো একই, আসুন আমরা সবাই মেনে চলি। আমার বক্তব্যে আমি অনেকগুলো সাদৃশ্যতার কথা বলেছি, এজন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। আমাদের সাথে অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে জানে না। কারণ মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের স্ব স্ব ধর্ম সম্পর্কে জানে না। এমনকি অনেক মুসলমান প্রতিবাদ করেছে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে সাদৃশ্য? অসম্ভব, অনেক লোক সেখানে এসেছিল শুধু তর্ক করার জন্য। আমি নাকি আজেবাজে বকছি। কিন্তু তারা যখন বক্তৃতা শুনল, তখন বিস্মিত হল। যারা তর্ক করতে এসেছিল, তারাও কথাগুলো মেনে নিল। অনেক হিন্দুও সেখানে ছিল। বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং মেনে নিতে হবে।

আর প্রথম কথাটা হল- "আমরা উপাসনা করি একমাত্র আল্লাহর।" এটাই সবচেয়ে বড় মিল। এখানে আরো উদ্ধৃতি দেয়া যায়, বেদ, ভগবদগীতা, ছন্দোগিয়া উপনিষদের। ছন্দোগিয়া উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- "স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।" এছাড়া শ্বেতাসত্র উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯নং অনুচ্ছেদে আছে- "তাঁর কোন প্রভু নেই তার কোন বাবা-মা নেই।"

এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি। তার মানে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোন মা-বাবা নেই। তার কোন মালিক নেই, এছাড়া এই গ্রন্থের ৪৯ অধ্যায়ে, ১৯ নং অনুচ্ছেদে আছে- "সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার কোন প্রতিকৃতি নেই, কোন প্রতিমা নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই, তার কোন মূর্তি নেই, তার কোন ছবি নেই। একই কথা বলছে যজুর্বেদ ৩২ নং অধ্যায়, ৩নং অনুচ্ছেদে-এ "সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোন প্রতিকৃতি নেই।"

তাহলে আপনি যদি বেদ পড়েন এবং ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করেন, দেখবেন সেখানে একটা স্রষ্টা। কয়েকদিন আগে স্টার নিউজ চ্যানেলের একটা সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল- "বন্দে মাতরম" শব্দটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এটা কি মুসলিমরা বলতে পারবে? আমি এর উত্তরে তাদেরকে বললাম, এটা মুসলমান বলবে কিনা এ ব্যাপারে পরে আসছি। আগে বলি হিন্দু ধর্ম কি বলে। আমি বললাম- বেদের পণ্ডিতরা এ কথা স্বীকার করবে যে, বেদে বলা আছে "স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই।" তাই আপনি যখন বলছেন, "বন্দে মাতরম" অর্থাৎ এদেশ আমার মা। তাকে স্রষ্টা বলছেন এখানেও আমি সাধারণ লোকদের কথা বলছি না যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তবে পণ্ডিত কাউকে করলেই তিনি বলবেন যে, "বন্দে মাতরম" আর বেদের কথা পরস্পর বিরোধী। কারণ 'বন্দে মাতরম" কম করে হলেও তিন জায়গায় বলছে, "আমি তোমার সামনে নতজানু হই, আমি তোমাকে পূজা করি।" আপনারা দেখবেন আর্য সমাজ এবং অনেক বিখ্যাত পন্ডিত তাদের মতে, বেদের ভাষ্য অনুযায়ী মূর্তিপূজা করা নিষিদ্ধ। বগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে আছে- "মূর্তি পূজা করা উচিত নয়।"

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরা এখন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। তবে বেদ কিন্তু বলছে একজন স্রষ্টার কথা। এছাড়াও বন্দে মাতরমে আমি তোমার সামনে নতজানু হয়ে পূজা করছি একটু আগে উপনিষদ থেকে যে উদ্ধৃতি দিলাম তার বিরুদ্ধে যারা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ১২টি লাইনে আমাদের আপত্তি আছে। তিনবার বলা হয়েছে "বন্দে মাতরম" যার অর্থ তোমার সামনে নতজানু হই। তিনবার বলা হয়েছে- "এই দেশ আমার মা"। তিনবার বলা হয়েছে- আমি পায়ে চুমু দেব, আরো তিনবার বলা হয়েছে এদেশ স্বর্গীয়। দেশকে বলা হচ্ছে লক্ষ্মী, দুর্গা- এইসব কিছুই আপত্তিকর। আমরা মুসলিম দেশকে অনেক ভালবাসি; কিন্তু সর্ব শক্তিমান ছাড়া কারো কাছেই নতজানু হব না। এমনকি আমাদের মা, যে মা আমাদেরকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। আমরা মাকে ভালবাসি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা মায়ের সামনে নতজানু হই না। আর যে মানুষটাকে আল্লাহ তায়ালার পরে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি আমাদের সেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর সামনেও আমরা নতজানু হই না। এই "বন্দে মাতরম" গাওয়ার আসলেই কোন প্রয়োজন বা কার্যকারিতা আছে? আসলে এটা একটা প্রাকটিক্যাল গেম.... রাজনীতিবিদরা যেটাকে ভোট ব্যাংকের জন্য ব্যবহার করছে বা কাজে লাগাচ্ছে। তারা তারিখটা নিয়েও খেলা করছে।

আপনারা জানেন ১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গানটা লিখেছিলেন আর সেটা ছাপা হয় ১৮৮২ সালে, তাহলে ১২৫ বছর এবং ৭ সেপ্টেম্বর কোত্থেকে আসে। এই ভুলটা করেছে রাজনীতিবিদরা, খেলাটা তাদেরই। এছাড়াও সৌদিতে যে অনেক মুসলমান আছে তারা তাদের দেশের কাছে নতজানু হয় না, পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নতজানু হয় না। কারণ এটা শিরক। তাই যদি বলেন– ভারতের মুসলমানরা দেশপ্রেমিক না সে ক্ষেত্রে আমি বলব আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এই দেশকে অনেক উন্নত করেছেন। আমরাও এই দেশ অনেক অনেক ভালবাসি, প্রয়োজনে সত্যের জন্য দেশের হয়ে জীবন দিতে রাজি আছি; কিন্তু আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নতজানু হবো না।

প্রশ্ন : আমার নাম সাইফ। আমার প্রশ্ন হল মুসলমানরা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে? আর এজন্যই কি সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হচ্ছে। দয়া করে আপনার মতামতটা জানাবেন।

ডা. জাকির নায়েক : আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর পেছনের মূল কারণ হলো অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা নয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের এটা অংশ নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে, তবে আসল কারণটা হলো অবিচার। কোন সংখ্যালঘু বিশেষ গোত্রের মানুষের উপর নির্যাতন। আপনি যদি গতকালের "সানডে" খবরটা পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে, উইলিয়াম নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নাইন-ইলেভেন নিয়ে লিখেছেন। তিনি সেখানে একটা উপদেশ দিয়েছেন যে, এটা হতে পারে কাশ্মীরের বিদ্রোহীরাই মুম্বইতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন এর কারণটা কি? তার মত অনুযায়ী কাশ্মীর যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। তারা শান্তি প্রিয় মানুষ, তবে কেন তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তরটাও তিনি নিজেই দিয়েছেন যে, এর মূল কারণ হলো- কাশ্মীরে গণতন্ত্রের নামে চলছে প্রহসন, এখানে গণতন্ত্রের অপব্যবহার হচ্ছে।

সেজন্যই সাধারণ নিরীহ মানুষগুলো প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এটাও আমার মন্তব্য নয়, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। একই অবস্থা ফিলিস্তিনে। সেখানে তারা যুদ্ধ করছে কারণ তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাই অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে, প্রতিশোধ নিচ্ছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ হল কোন দল বা গোত্রের উপর অন্যায়, অবিচার, যারা তাদের বিপক্ষে তারা এটাকে সন্ত্রাস বলছে, উদাহরণ স্বরূপ ভগত সিং দেশের জন্য লড়েছিলেন। বৃটিশ সরকার তাকে সন্ত্রাসী বলেছিল আর আমরা তাকে বলি মুক্তিযোদ্ধা। তাই এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনি আপনার সুবিধামত কাউকে সন্ত্রাসী বলবেন, আর কাউকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলবেন, সন্ত্রাসের অনেক অর্থ আছে, অনেক সংজ্ঞা আছে, যেটা ভৌগোলিক অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয় এবং ইতিহাসের কারণেও বদলায়। তাই এখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে তাহলে যথার্থ প্রতিকার সম্ভব।

প্রশ্ন : ক্রিস্টফার লোবো নামে একজন ভদ্রলোক চিরকুটে একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কিভাবে প্রমাণ করবেন যে, নাইন-ইলেভেন ঘটনা ভেতর থেকেই ঘটেছে?

ডা. জাকির নায়েক : নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকে হয়েছে এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটা খবর ছাপা হয়েছিল যে, "আমেরিকার ৭৫ জন প্রফেসর বিশ্বাস করেন যে, নাইন- ইলেভেনের ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল।" টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে আরো বলা হয়েছে– আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন অধ্যাপক মন্তব্য করেন এই বিস্ফোরণটা ভেতরের কারো কাজ এবং হোয়াইট হাউজের কিছু রাজনীতিবিদদের পরিকল্পনাতেই টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে। আর তাদের মতে, এর প্রধান কারণ হলো যুদ্ধ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এটা একটা ওপেন সিক্রেট। তাদের মধ্যে জোন নামে একজন অধ্যাপক বলেছেন- আমরা বিশ্বাস করি না যে ১৯ জন ছিনতাইকারী আর আফগানিস্তানের কিছু গুহাবাসী এমন একটা পেশাদার কাজ করে বসবে একাই। কোনভাবে এটা হতে পারে না, তাই আমরা কথা দিচ্ছি আসল সত্যটা অবশ্যই বের করব এবং সকলকে সেটা জানাব।

আমরা সরকারের বানানো কথায় বিশ্বাস করি না। তিনি আরো বলেছেন, আমরা অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে বলছি। আমরা জানি যে লোহার টুইন-টাওয়ারের লোহার বীমগুলো ছিল খুব মজবুত। বিমান বিস্ফোরণের সময় যে তাপের সৃষ্টি হয় সেই তাপে ঐ মজবুত ভীমগুলো গলে যাওয়ার কথা নয়। এখানে সবকিছু

পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে, সে জন্যই পুরা অবকাঠামো ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভিডিও আর বই বের হয়েছে। আমি নিজেই অনেকগুলো দেখেছি, তন্মধ্যে একটি হলো অধ্যাপক স্টিভজোন্স্ এর ভিডিও। গতকালকের কাগজে ঠিক এর তিনদিন পর একটা খবর দেখলাম যে, অধ্যাপক স্টিভ জোন্সকে অসুস্থতার ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। চিন্তা করুন, এরূপ আরো অনেক ভিডিও আছে যেগুলো আপনারা দেখে থাকতে পারেন। এর মধ্যে একটার নাম "লুজ চেঞ্জ নাইন ইলেভেন।" ২১ বছর বয়সের এক আমেরিকান তরুণ এই প্রামাণ্য চিত্রটি বানিয়েছে। এটা সিএনএন ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিও চিত্র, কিছু সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে একটি ডকুমেন্ট। সেখানে তিনি বলেছেন– প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে বিমান দুটো যাত্রীবাহী বিমান হতেই পারে না। দেখে মনে হচ্ছে একটা সামরিক বিমান। তারপর বিমানটা যখন টাওয়ারের কাছাকাছি আসল বিমানে ডানা থেকে গুলি বর্ষণ করা হচ্ছিল। এরপর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সেই কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে তার কথা হয়েছে যারা টুইন-টাওয়ার বানিয়েছিল। সে বলেছে এটা একেবারেই অসম্ভব কারণ, টুইন-টাওয়ারটা এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, ঝড় টর্নেডোতে কিছুই হবে না। আর সামান্য একটা বিমানের আঘাতে এভাবে ধ্বংস হতে পারে না।

কারণ সেই বিস্ফোরণের সময় টুইন-টাওয়ারের তাপমাত্রা ছিল ১০০০° ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এই তাপমাত্রা ২০০০° হলেও কিছু হওয়ার কথা ছিল না। দশদিন পর সেই ম্যানেজার নতুন কথা বলতে শুরু করল যে এটা সম্ভব। বিমানের বিস্ফোরণে লোহার বীমের ক্ষতি হতে পারে।

আরেকজন অধ্যাপক এমন কথা বলেছেন, পরে তিনি তার মত পাল্টাননি। তাই তার চাকরি গিয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নিউইয়র্কের চল্লিশ, ষাট, সত্তর তলা বিশিষ্ট অনেক ভবনে আগুন ধরেছে; কিন্তু কোনটাই এভাবে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েনি। আমেরিকার ইতিহাসে টুইন-টাওয়ারই প্রথম ভবন ভাঙতে গেলে বোমা দিয়ে যেভাবে ভাঙ্গা হয় এটা ঠিক সেভাবেই ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ফায়ারম্যান যারা ছিল তারা বলেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল উপর থেকে বোমার সুইচ টিপছে আর বোমাফাটছে একের পর এক, তাহলে টুইন-টাওয়ার যেভাবে ভেঙ্গেছে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে সরকারের সবগুলো প্রমাণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। বলা হয়েছে বিমান চালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ জন ছিনতাইকারী এই কাজটি করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন বিমান যেভাবে টার্ন বা বাক নিয়েছে সেটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমি দীর্ঘদিন আকাশ পথে বড় বিমান চালকের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে এভাবে বাক নেয়া অসম্ভব। তাহলে চিন্তা করুন কতদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা লোক এভাবে প্লেন বা বিমান চালাতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলেন এটা অবশ্যই সামরিক বিমান। সরকার আমাদের আরো তথ্য দিয়েছে। তখন একটা ফোন এসেছিল যে বিমানটা ছিনতাই করা হয়েছে আর যাত্রীরা সবই সেখানে বন্দি। সে সময় একটা ফোন করেছিল একজন ফ্লাইট অফিসার। সে বলছে যে, "বিল্ডিং, পানি, ওহ ঈশ্বর! ওহ ঈশ্বর! যে সারা বছর বিমানে উড়ে বেড়ায় সেকি নিউইয়র্কে কখনো বিল্ডিং দেখেনি? আর একজন লোক বলছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম বলছি। মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমাদেরকে ছিনতাই করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর।

এখানে আমার প্রশ্নটা হলো যদি আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলি, তখন বলি আমি জাকির। এরূপ বলি না যে, আমি জাকির নায়েক বলছি; কিন্তু সে ব্যক্তি বলেছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম। যদি মার্ক তার মায়ের সাথে কথা বলে, তাহলে এভাবে বলবে কেন? আর টেলিফোন কল আপনি পাবেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে। আমি একটা সার্ভে করেছিলাম ৩২০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করে কিনা? ৪০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ

করার সম্ভাবনা .৪% । আর ৮০০০ ফুট উপরে সম্ভাবনাটা হবে ০.১% আর ৩২০০০ ফুট উপরে এই সম্ভাবনা .০০৬% । অর্থাৎ মোবাইল কাজ করার কোন সম্ভাবনাই নেই । এই প্রামাণ্য চিত্র বলছে আমেরিকান ফোন কোম্পানীগুলো এক উচ্চতায় সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করছে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরো জানা যায় যে, প্রত্যেক বিমানের দুটি "ব্লাকবক্স" থাকে যেটা ৩০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায়ও কিছু হয় না । অথচ ১০০০ থেকে ২০০০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেই বক্সের সব শেষ ।

এইসব কিছুই এখন প্রমাণ । এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে "উম্মাহ" নামে একটি সাময়িকীতে সাক্ষাৎকার দিলেন । তিনি বলেন, "আমি একজন মুসলিম তাই কোন মিথ্যা বলব না । আমার মত অনুযায়ী নিরীহ মানুষকে, নিরীহ নারী ও শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ । ইসলাম এটার তীব্র নিন্দা করে । ওসামা বিন লাদেন সাক্ষাৎকারে একথা বলেছিলেন । কয়েক দিন আগে "আল-জাজিরায়" একটি ভিডিও চিত্র দেখলাম "ওসামা বিন লাদেন নাইন-ইলেভেন" । যেহেতু ৭৫ জন অধ্যাপক বলছে এটা নিজেদের কাজ তাই সেটা ঘোরানোর জন্য পাঁচ বছর পরে এই খবর টিভিতে আসছে । এই ৭৫ জন অধ্যাপক কথা দিয়েছেন এর রহস্য ভেদ করবেনই । এবার পেন্টাগনের দ্বিতীয় আক্রমণটা নিয়ে বলি, পেন্টাগনে যখন বিমান ধ্বংস হল ঘাসের উপর সেই বিমানের কোন চিহ্ন নেই, শুধু পেন্টাগনের দেয়ালে একটা গর্ত । টিভিতে দেখেছি সেই গর্তটা বিমানের বডির সমান বড় । কিন্তু বিমানের ডানাটা কোথায় গেল? ডানার আঘাতের কোন চিহ্ন নেই পেন্টাগনে । যদি বিমানটা পেন্টাগনে ঢুকে যায় আর ডানা বাইরে থাকে, তাহলে ডানাটা হয় বাইরে থেকে যাবে অথবা দেয়ালের গায়ে গর্ত হবে । কিন্তু ভবনটিতে কিছুই হয়নি । সবকিছুই যেন সাজানো । এছাড়া লোকে বলছে বিমানটা ৪০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেছে । বিজ্ঞান বলে- বোয়িং বিমান ৪০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেলে একটা গাড়িও ছিটকে যাবে । একজন প্রাক্তন মিলিটারীম্যান বলেছেন- এটার শব্দ ছিল একটা মিসাইলের মত । বিমানের কিছুই সেখানে পাওয়া যায়নি, শুধু একটা যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন পাওয়া গেছে । এমনকি অন্য জায়গায় মাটিতে শুধু একটা গর্ত হয়েছে । এর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু সময় স্বল্প । একজন বোকাও বুঝতে পারবে এটা ভিতরের কাজ, কিন্তু মি. বুশ এ কথাটা বুঝতে পারেননি ।

আরো বলা হচ্ছে এসবের কারণেই আফগানিস্তানে আক্রমণ করা । তারপর ইরাক সব শেষে ইরান । এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, ইরানেও আক্রমণ করা হবে, তারা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে চায় । তাহলে এই সন্ত্রাসী আক্রমণ কেন? প্রথমত এটা হলো অবিচার, দ্বিতীয়ত এটা টাকার জন্য, ক্ষমতার জন্য । যখন রাজনীতিবিদরা দেখে তারা ভোট হারাতে যাচ্ছে তখন মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে যে, "আমাকে ক্ষমতায় বসাও নয়তো মুসলমানরা ক্ষমতায় বসবে, শাসন করবে ।" গুজরাটেও একই ঘটনা, মানুষের মনে ভয় তৈরি করা হচ্ছে যে, আমাদের ক্ষমতায় না বসালে মুসলমানরা তোমাদের মেরে ফেলবে, তাই তারা আবার ক্ষমতায় আসল । আমরা যেটা বুঝি নাইন-ইলেভেনের ঘটনা আসলে এটা একটা ভিতরের কাজ । যার সপক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে, তাই এটা একেবারে ওপেন সিক্রেট (সর্বজনবিদিত গোপন তথ্য) যে, এই আক্রমণটায় বুশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । এক কথায় আক্রমণটা বুশ নিজেই করেছিল।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হল আমি বিশ্বাস করি যে, সন্ত্রাস হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । আরো মনে করি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও । কোন মানুষের সাথে যদি অন্যায় করা হয়, তাহলে সে প্রতিশোধ নিতে অন্য মানুষকে হত্যা করে, তবে সেটা কি তার জন্য অপরাধ? আমার অবস্থাও যদি গুহরাটির মত হত, তাহলে তারা যা করেছে আমিও তাই করতাম । পুলিশ ন্যায় বিচার করে না, আদালতে গেলে ১০ বছর লেগে যায়, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ এখানেও কি করবে? আপনি কি উপদেশ দিবেন?

ডা. জাকির নায়েক : আমিও একমত যে, এই পরিস্থিতিতে আপনিও একই কাজ করবেন এবং যে কোন সাধারণ মানুষও এই কাজ করবে এটা স্বাভাবিক। যদি না আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে। এমনকি আমি নিজেও এ কাজ করতে চাইব, যখন আমি কুরআনকে জানব এবং এটা জানব যে, কুরআন এটা নিষেধ করেছে। কারণ আমি যদি নিরীহ মানুষকে হত্যা করি, তাহলে আমিও সেই ব্যক্তির মত কাজ করলাম যে আমার উপর অন্যায়-অবিচার করেছে। অর্থাৎ, কেউ আমার ঘর ডাকাতি করলে, আমিও আরেকজনের ঘর ডাকাতি করতে পারি না। তবে যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি এবং প্রমাণ করে শাস্তি দেই সেটা আলাদা কথা।

কুরআনও একথাই বলেছে নিরীহ মানুষ হত্যা করা যাবে না। সুতরাং কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এই উপায়ে প্রতিশোধ নেয়া সমীচিন নয়। আমি সাধ্যমত প্রমাণ জোগাড় করব, সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করব তারপরে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পায়, তখন আমার কিছুই করার নেই। এই সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর জন্য যারা দায়ী তারা হচ্ছে– রাজনীতিবিদরা ও পুলিশ, আর যারা মারা গেছে অথবা বোমা ফাটিয়েছে যদিও এই পৃথিবীতে তাদের উপযুক্ত বিচার হয় না। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে আছে–

"প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।"

আসল বিচার হবে কিয়ামতের দিন। এটাই আমরা মনে করি। আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব তিনিই বিচার করবেন। যেমন আমরা যদি আজকে হিটলারকে ধরি, তাহলে তাকে আপনি কি শাস্তি দিবেন? ৬০ লক্ষ নর হত্যার শাস্তি আপনি দিতে পারবেন? তাকে আপনি সর্বোচ্চ একবার মারতে পারবেন। বাকী ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জনের কি হবে?

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় ৫৬ নং আয়াতে আছে–

অর্থাৎ, "যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দোযখের আগুনে দগ্ধ করব, আর যখনই তাদের চামড়া আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে, তখনই নতুন চামড়া সংযোজন করা হবে, যাতে তারা শাস্তি ভালভাবে আস্বাদন করতে পারে।"

বিজ্ঞান বলে মানুষের শরীরে ব্যথা অনুভবকারী আছে যেটা ব্যথা বা যন্ত্রাণাকে ধরে রাখে, তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– কিয়ামতের দিন তাদের চামড়া আগুনে পোড়ান হবে, যাতে তারা শাস্তির যন্ত্রণাটা পুরাপুরি উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহ যদি চান হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার মারতে পারবেন। যেটা আমরা কেউ পারব না। তাই আমরা তাদের বিচারের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেব।

সমাপনী বক্তব্যে

আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কাছে জাকির নায়েকের উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন এসেছে, ভবিষ্যতে আমরা (ইনশাআল্লাহ) এইসব প্রশ্নোত্তর ডা. জাকির নায়েকের মুখে শুনব।

ডা. জাকির নায়েককে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করার জন্য এবং আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরও ধন্যবাদ জানাই অনেক আগ্রহ নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ আস্সালামু আলাইকুম।